স্বাস্থ্যের সন্ধানে

৩

হৃদরোগ

কারণ ও প্রতিকার

ডাঃ কে. কে. হাইদার সিদ্দিকী

হৃদরোগ

কারণ ও প্রতিকার

ডাঃ কে. কে. হাইদার সিদ্দিকী
এম. ডি (কলি) এফ. আই. সি. এ. (ইউ. এস. এ.)
এফ. সি. সি. পি. (ইউ. এস. এ.)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

HRIDROG
KARAN-O-PRATIKAR
Dr. K. K. H. Siddiqui

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯২

প্রকাশক
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ : শ্রী গণেশ বসু

দাম : বারো টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বাস্থ্যের সন্ধানে সিরিজের তৃতীয় বই বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কে কে. হায়দার সিদ্দিকীর হৃদরোগ কারণ ও প্রতিকার। সারা পৃথিবী জুড়ে হৃদরোগ আজ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মানুষ ক্রমশই বেশি বেশি সংখ্যায় হৃদযন্ত্রের অসুখে ভুগছেন। পরিবেশ ও আজকের দুনিয়ার নানা কারণে মানুষের মনে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে হার্টের অসুখও বাড়ছে। অথচ একটু সচেতন হলেই আমরা এই রোগের সাক্রমণকে কিছু পরিমাণে প্রতিহত করতে পারি ও অনেক অবাঞ্ছিত অকাল মৃত্যুও এড়াতে পারি। শুধু হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা নয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণচেতনার উন্মেষ করার জন্যই পি. আর. সি-এর সহযোগিতায় আমাদের এই প্রয়াস। হৃদরোগের জটিল বিষয়কে ডাঃ সিদ্দিকী সরল ও সহজভাবে বিবৃত করেছেন।

জনসাধারণের উপকারে লাগলে আমাদের এই প্রচেষ্টাও শ্রম সার্থক হবে।

প্রকাশক

ভূমিকা

যদি একটা পরিসংখ্যান নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে হার্টের বা হৃদযন্ত্রের অসুখে মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। দুঃখের কথা এই যে অধিকাংশ লোকের মধ্যে হার্ট এবং হার্টের অসুখ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব রয়েছে। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে যেসব কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী হার্টের অসুখ এবং হার্টের অসুখজনিত মৃত্যুর জন্য, সেগুলিকে পরিহার করে নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন কাটানো যেতে পারে। হার্ট ও হার্টের বিভিন্ন রোগ—বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। স্বল্প পরিসরে আমি সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র বিষয়টিকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে। তাই হার্টের প্রতিটি রোগের বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছি। আমার চেষ্টা সফল হলে খুশিই হবো। আর একটা কথা, যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে আমি medical term-গুলির বাংলা ভাষান্তর করেছি কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না হওয়ায় original English term-গুলিকে যথাযথ রাখতে বাধ্য হয়েছি, কখনো অনুবাদ করেছি। আশা করি এর ফলে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

ডাঃ হাইদার সিদ্দিকী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১

হার্ট ঃ অবস্থান ও কাজ

হার্টের নার্ভতন্ত্র

হার্টের প্রকোষ্ঠ ও কপাটক

হার্টের নিজস্ব রক্তের যোগান

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ হৃদরোগের কারণসমূহ ১১

অ্যাথেরোস্ ক্লেরোসিস

রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিস

জন্মগত হার্টের অসুখ

হৃদপেশীর রোগ

উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্টের অসুখ

করোনারি হার্ট ডিজিস

অ্যানজাইনা পেক্টোরিস

অনিয়মিত অস্থির অ্যান্‌জাইনা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপসংহার ৩৩

হৃদযন্ত্রের সঙ্গে বংশগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক

হার্টের সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক

হার্টের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক

হৃদযন্ত্র ও খাদ্যাভ্যাস

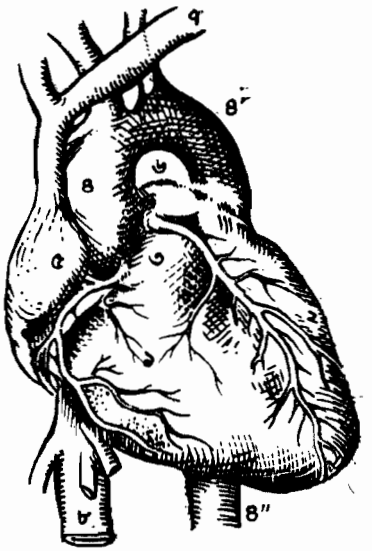

চিত্র ১ : 1. ডান নিলয় (Right Ventricle)
2. বাম নিলয় (Left Ventricle)
3. পালমোনারী ধমনী (Pulmonary Artery)
4. মহাধমনী (Aorta)
5. ডান অলিন্দ (Right Auricle)
6. বাম অলিন্দ (Left Auricle)
7. সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভার শিরাসমূহ (Veins of Vena Cova Superior)
8. ভেনা ক্যাভা ইনফিরিয়র (Vena Cova Inferior)
9. যকৃতের শিরা (Hepatic Vein)

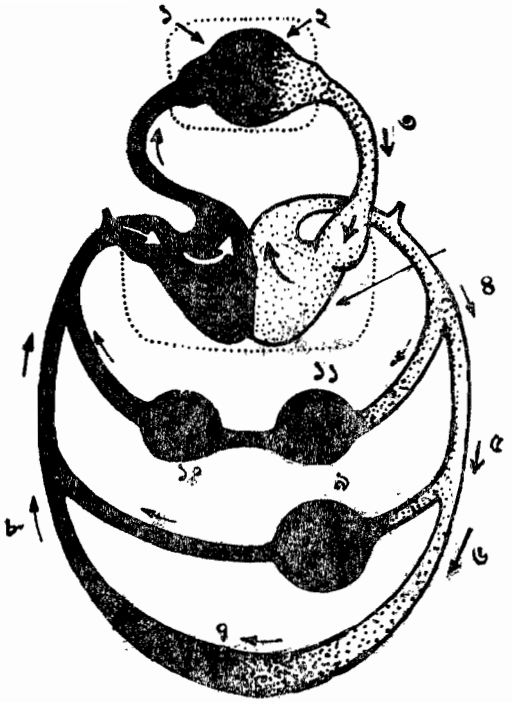

চিত্র ২ঃ ১। ফুসফুস (অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড বিনিময়)।

২। ফুসফুসের কৈশিক জালিকা। এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড বিনিময় করে অক্সিজেন সংগ্রহ করে ফুসফুস।

৩। ফুসফুস থেকে রক্ত অক্সিজেন বহন করছে।

৪। কেন্দ্রীয় পাম্পিং ঘর (হার্ট)।

৫। রক্ত শরীরে যাচ্ছে—বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন ও পুষ্টি।

৬। পাকস্থলী ও অন্ত্র।

৭। রক্ত—চামড়া, মাংসপেশী প্রভৃতি থেকে।

৮। হৃৎপিণ্ডে রক্ত সংগৃহীত হচ্ছে। এই রক্তে আছে কার্বন ডাই অক্সাইড।

৯। বৃক্ক।

১০। যকৃৎ।

১১। পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে রক্ত।

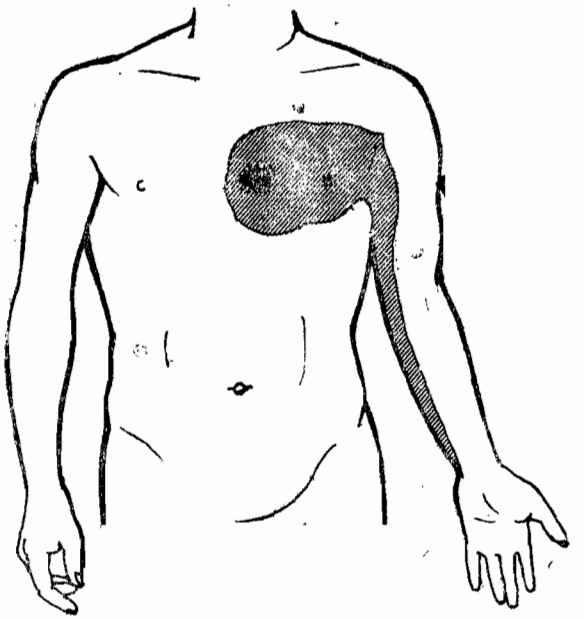

চিত্র ৩ : অ্যানজাইমা পেকটরিস-এ ব্যথা হতে পারে কালো দাগ দেওয়া জায়গাগুলিতে।

প্রথম অধ্যায়

১. হার্ট : অবস্থান ও কাজ

মানবদেহে বুকের মাঝখানে কিছুটা বাঁদিকে হার্ট বা হৃদযন্ত্রের অবস্থান। আকৃতিতে খানিকটা শঙ্কুর (cone) মতো যার চূড়া বা apex কিছুটা বাঁদিকে নিম্নমুখী। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও সোওয়া তিন ইঞ্চি চওড়া, হার্টের ওজন পুরুষের ক্ষেত্রে এগারো আউন্স এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় আউন্স। হৃদ্ধরা ঝিল্লী (pericardium) নামক একটি পাতলা পর্দা দ্বারা হার্ট আচ্ছাদিত ও সুসংরক্ষিত। ভিতরের প্রকোষ্ঠগুলো এণ্ডোকার্ডিয়াম (endocardium) নামক একটি মিহি পর্দার সাহায্যে আচ্ছাদিত থাকে। হৃদযন্ত্রের দেওয়াল মাংসতন্তুর (muscle fibres) সাহায্যে নির্মিত ; একটি দেওয়ালের নাম ব্যবধায়ক পরদা (septum), যা হৃদযন্ত্রকে বাম ও ডান দু'ভাগে ভাগ করেছে।

হৃদযন্ত্রের দুটি ভাগেই একটি অলিন্দ (auricle) ও একটি নিলয় (ventricle) আছে। অলিন্দ ও নিলয় হলো হৃদযন্ত্রের সংগ্রহণ ও সংবহন প্রকোষ্ঠ। রক্ত অধরা ও উত্তরা মহাশিরা (superior and inferior vene cavae) এর মধ্য দিয়ে ডানদিকের সংগ্রহণ প্রকোষ্ঠে (right auricle) আসে ; অতঃপর সেই রক্ত ট্রাইকাসপিড (tricuspid) নামক একটি কপাটিকার (valve) মধ্য দিয়ে নীচের দিকে বাহিত হয়ে ডানদিকের সংবহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেখান থেকে সেমিলুনার ভাল্ভ (semilunar valve) নামক অপর এক কপাটিকার ভিতর দিয়ে রক্ত বাহিত হয়। (এই কপাটিকা কিছুটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি বলে এর নাম semilunar valve)। এরপর রক্ত প্রবেশ করে ফুস্‌ফুস্‌াধিগ ধমণী (Pulmonary artery)তে, যা উভয় ফুস্‌ফুসে (lungs) প্রবিষ্ট হয়। ফুস্‌ফুস্‌ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করে

এবং ফুস্‌ফুসাধিগ ধমনীর মাধ্যমে হৃদযন্ত্রের বাম সংগ্রহণ প্রকোষ্ঠে (left auricle) প্রবিষ্ঠ হয়। অতঃপর রক্ত বাম সংবহণ বাহিত হয় বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকার প্রকোষ্ঠে (bicuspid বা mitral valve) মাধ্যমে এবং অপর একটি সেমি-লুনার ভাল্ব (semilunar valve)-এর সাহায্যে মহাধমনী (aorta) নামক 'বণ্টন বিভাগে' (distribution department) প্রবিষ্ট হয়ে ধমনীতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

নিলয়ের সংকোচন হৃদযন্ত্রকে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালনের জন্য শক্তি যোগান দেয়। এই কর্মকাণ্ডটিকে বলা হয় হৃদস্পন্দন (heart beat)। নিলয়ের সংকোচন থেকে শিথিলতা প্রাপ্তিই (relaxation) হৃদযন্ত্রের একমাত্র বিরাম। যখন কোনো ডাক্তার তাঁর stethoscope-এর সাহায্যে কারোর হৃদযন্ত্রের শব্দ শোনেন (auscultation) তখন তিনি কপাটিকার খোলা বা বন্ধ হওয়ারই শব্দ শোনেন।

মানুষ যখন বিশ্রাম-অবস্থায় থাকে তখন প্রতি মিনিটে হৃদযন্ত্র আনুমানিক 5 লিটার রক্ত পাম্প করে (একে বলে cardiac output বা হৃৎ-উৎপাদ্)। পরিশ্রমের সময় হৃদযন্ত্রের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা প্রতি মিনিটে 5 গুণ অর্থাৎ 25 লিটার হয়। গড় হিসেবে প্রতি 24 ঘণ্টায় হৃদযন্ত্র 3,000 থেকে 5,000 গ্যালন রক্ত ; বা প্রতি বছরে 1,400,000 গ্যালন রক্ত পাম্প করে। এটা মোটেই অবাক হবার মতো কথা নয়। যে ব্যক্তি 80 বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত, সেই 80 বছরে তার হৃদযন্ত্র 100 million gallon রক্ত পাম্প করে থাকবে—যা কিনা 2,100টি চার-ইঞ্জিনের 747 বোয়িং প্লেনের ট্যাঙ্ক পূর্ণ করতে সক্ষম।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সংকোচন ও সংবহনের মাধ্যমে হৃদযন্ত্রকে কী পরিমাণ কাজই না অহরহ করতে হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয়, আমাদের জন্ম মুহূর্ত নয় বরং তার অনেক আগে থেকে অর্থাৎ মাতৃ-জঠরে থাকাকালীন সময় থেকে, হৃদযন্ত্রের কাজ শুরু হয়ে যায়—এত-টুকু বিশ্রাম তার নেই। এই সংকোচন ও সংবহনের দ্বারা হৃদযন্ত্র শরীরের যাবতীয় অঙ্গের প্রতিটি কোষে রক্তের মাধ্যমে সমানে যোগান দিয়ে চলেছে জীবনদায়ী অক্সিজেন, পোষক (nutrients), ধাতব

পদার্থ বা মিনারেল্‌স্‌ (minerals) এবং জল ; এবং একই সংগে দূরীভূত করছে, বিপাকীয় উপজাত অংশ (metabolic by products), অতিরিক্ত জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide)। শুধু তাই নয়, রক্তকে সর্বক্ষণ সঞ্চালিত রাখার ফলে শরীরের হরমোন (hormone)-গুলিও পুষ্টি লাভ করে। শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাথমিকভাবে রক্ত পৌঁছায় বহুপার্শ্বীয় নালিকা (branching vascular tree)র মাধ্যমে এবং শেষে হয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (যা কিনা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে হয়) অসংখ্য রক্ত জালকে (blood vessels, the capillaries)। আমাদের দেহে কয়েক বিলিয়ন (billion) রক্তজালক আছে এবং তাদের গাত্র-সংলগ্ন যে কয়েক ট্রিলিয়ন (trillion) কোষ আছে রক্ত সে-গুলিকে পুষ্টি যোগায়। শুধুমাত্র 10 সেকেণ্ডের মধ্যে সংকোচন ও সংবহন কার্যের মাধ্যমে হৃদযন্ত্র সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে শরীরকে পুষ্টিদান করে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো মানবদেহের বিভিন্ন যন্ত্রে (organ) যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা কিন্তু একই গতিতে (rate) হয় না ; বরং বলা যেতে পারে প্রতিটি যন্ত্রের জন্যে নির্দিষ্ট প্রয়োজনানুযায়ী রক্ত সংবাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হালকাচালে দৌড়ানোর (jogging) সময় পায়ের রক্ত জালক (blood vessels) প্রসারিত হয় এবং এর ফলে পায়ের মাংসপেশীতে (muscles) রক্ত দ্রুতহারে সঞ্চালিত হয়, কারণ সেই মুহূর্তে পায়ের মাংসপেশীর প্রয়োজন অন্যান্য সময় অপেক্ষা বেশি রক্ত। আবার ভোজনান্তে বিশ্রামের সময় আনুপাতিকহারে অন্ত্রে (gut) বেশি হারে রক্ত সঞ্চালিত হয়, কিন্তু মনযোগ সহকারে পড়াশুনার সময় আনুপাতিকহারে মস্তিষ্কে বেশি হারে রক্ত সঞ্চালিত হয়। এই যে রক্ত সঞ্চলনের সুসমঞ্জতা এর খুবই প্রয়োজন আছে। কারণ যদি সব রক্তবহা নালী একই সময় প্রসারিত হয় (যা একান্তই অসম্ভব) তাহলে হৃদযন্ত্রকে প্রতি মিনিটে 90 pint (1 pint = প্রায় 568 লিটার) পাম্প করতে হবে, কিন্তু তা অসম্ভব ব্যাপার যেহেতু হৃদযন্ত্রের প্রতি মিনিটে পাম্প করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা হলো 50 pint রক্ত।

২. হার্টের নার্ভতন্ত্র (Heart's Nervous System)

হৃদযন্ত্রের নিজস্ব নার্ভকেন্দ্র (nerve centre) আছে। এর কাজ হলো হৃৎস্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করা ; পেশী সংকোচনকে নিয়মিত করা ; এবং দু'টো অলিন্দের সংকোচন ও শ্লথন (relaxation)-এর মাধ্যমে নিলয়দ্বয়ের পাম্পের কার্যকে সমলয় (synchronize) করা।

হৃদযন্ত্রের নার্ভকেন্দ্র হলো একটি ছোট্ট ব্যাটারি, যার নাম হলো সাইনাস নোড (sinus node)। সাইনাস নোড অবস্থান ডান অলিন্দে (right atrium)-এ। এমন কতিপয় বিশেষ পেশী ও নার্ভকোষ দ্বারা এটি নির্মিত যেগুলি রাসায়নিক ভাবে আহিত (chemically charged)। সাইনাস নোড-এর কাজ একটি বৈদ্যুতিক ধারক-এর (electric capacitor) ন্যায় যা কিনা পর্যায়ভিত্তিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি (generate) করে। নার্ভগুচ্ছের (nerve bundles) মাধ্যমে এই তড়িৎ প্রবাহ প্রথমে অলিন্দের, পরে নিলয়ের পেশীতে সংবাহিত হয়। এই তড়িৎকরণ (electric al discharge) ও তড়িৎ সংবহন (electrical conduction) এত সূক্ষ্ম একটি কাজ এবং এত নিয়মিত ব্যবধানে ঘটতে থাকে যে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ঠিক নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী ঘটে। যদিও এই সূক্ষ্ম ব্যাটারিটি স্বয়ংক্রিয় (automatic) কিন্তু এর প্রকৃতকরণ-হার (actual rate of discharge) সতত পরিবর্তিত হয় মস্তিষ্ক বাহিত নির্দেশ অনুযায়ী (messages from the central nervous system)

সাইনাস নোড থেকে নার্ভগুচ্ছ (nerve bundles) যে বৈদ্যুতিক ঘাত (impulse) হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীতে প্রেরণ করে সেই কর্ম প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট লক্ষণীয়। প্রথমে এই নার্ভগুলি অলিন্দস্থিত পেশীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সেই ঘাত একটি সুইচ কেন্দ্রে (switching centre), যার নাম এট্রিওভেনট্রিকুলার নোড (atrioventricular node বা AVN node) বিলম্বিত হয় এবং এই বিলম্ব ঘটে একটি নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী। এক সেকেন্ডের 120 থেকে 200 সহজতম ভাগে। অতঃপর ঘটে

নিলয়ের-এর সংকোচন। কিন্তু এই বিলম্বের কারণ কি? এর হেতু হলো অলিন্দকে সংকোচনের যথেষ্ট সময় দেওয়া যখন নিলয় শ্লথ (relaxed) হয়ে পড়ে এবং উভয়ের মধ্যস্থিত কপাটিকা উন্মুক্ত থাকে।

৩ হার্টের প্রকোষ্ঠ ও কপাটিক (Heart Chambers and Heart Valves)

আমরা জানি যে মানবদেহের হৃদয়যন্ত্রে চারটি প্রকোষ্ঠ (chambers) আছে। দুইটি প্রকোষ্ঠ হলো নিলয় (ventricles pumping chamber) এবং অপর দুইটি হলো অলিন্দ (atrnia বা collecting chambers)। বাম দিকে বাম নিলয় ও একটি বাম অলিন্দ (collecting chambers)। আবার ডান দিকে একটি নিলয় ও অলিন্দ এবং (right atrium)। নিলয় দুইটি দ্বিধাবিভক্ত আছে অংশত পেশীবহুল (partly muscular) ও অংশত ঝিল্লীময় (partly membranous) দেওয়াল দ্বারা, যার নাম (septum), এবং অলিন্দ দুইটি বহুলাংশে সূক্ষ্ম ঝিল্লীর দ্বারা বিভক্ত। এই বিভাজনকারী দেওয়ালগুলি ছিদ্র বিহীন (nonporous)। ডান দিকের অলিন্দের সঙ্গে ডান নিলয়ের এবং বাম দিকের অলিন্দের সঙ্গে বাম নিলয়ের যোগাযোগ আছে। কিন্তু প্রতি যোগাযোগের মধ্যে একটি করে কপাটিকা অবস্থিত যেটা প্রতি হৃদস্পন্দনের চক্রাকার সঞ্চালনে এক সময় খোলে ও এক সময় বন্ধ হয়। সূক্ষ্ম ঝিল্লীময় কলার (fine membrane tissue) দ্বারা নির্মিত এই কপাটিকা। হার্টের অভ্যন্তরে যে বিভাজক রেখা (dividing line), নিলয় ও অলিন্দকে বিভক্ত করেছে তার দেওয়ালের সঙ্গে কপাটিকাগুলি সংযুক্ত থাকে।

কপাটিকাগুলির নির্বাধ প্রান্তগুলি (free ends of the valves) বিভিন্ন point-এ সূক্ষ্ম কলার সারির ন্যায় (fine strips of tissue) সম্পৃক্ত থাকে। যেগুলি আবার নিলয়ে অবস্থিত বিশেষ মাংসপেশী (papillary muscles) সঙ্গে দৃঢ়বন্ধ থাকে।

অপর দুইটি কপাটিকা, পূর্ব-উল্লিখিত কপাটিকাগুলি

থেকে প্রকৃতিগতভাবে আলাদা, নিলয় দুইটি বহির্মুখে (exit) অবস্থিত ; যেখান থেকে তারা দুইটি বৃহৎ রক্ত নালীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে তাদের রক্ত পাম্প করে পাঠায়। এই দুইটি কপাটিকার গুরুত্ব হলো এই যে এরা নিলয়-এ রক্তের ফিরে যাওয়া (back flow) বন্ধ করে এমন এক সময় যখন সংকোচনের পর প্রকোষ্ঠটি শ্লথ (relax) হয়।

এইভাবে দুইটি করে বিভিন্ন ধরনের কপাটিকা হার্টের প্রতিটি প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থেকে একবার উন্মুক্ত হয়, একবার রুদ্ধ হয়। নিলয়ের সম্মুখস্থিত কপাটিকা (valve) শ্লথনের সময় উন্মুক্ত থাকে, এবং নিলয়ের বহির্মুখস্থিত কপাটিকা সংকোচন বা contraction-এর সময় উন্মুক্ত থাকে। নিলয়ের বিপরীতমুখী অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি কপাটিকা একবার করে রুদ্ধ থাকে। এই ভাবে রক্ত সংবহন (pumping of blood) একমুখীভাবে সুনিশ্চিত হয়।

৪. হার্টের নিজস্ব রক্তের যোগান (Heart's own supply : The coronary arteries)

শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করা হৃদযন্ত্রের একটি অত্যন্ত জরুরি কাজ। কিন্তু হৃদযন্ত্রের নিজস্ব রক্তেরও প্রয়োজন যাতে করে সে পাম্প করার শক্তি পায় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজস্ব পেশী সংকোচন করতে পারে। হৃদযন্ত্রের রক্তের এই চাহিদা হৃদযন্ত্রস্থিত প্রকোষ্ঠ-বাহিত রক্ত থেকে আসে না। এটা আসে হৃদযন্ত্রের নিজস্ব রক্তবাহী নালিকা থেকে যাদের নাম করনারী ধমনী। মহাধমনী (aorta) নামের বৃহৎ রক্ত নালীগুলির (large blood vessels) প্রাথমিক শাখাগুলিই (the first branches) হলো করোনারী ধমনী।

করোনারী ধমনীর সংখ্যা দুইটি : ডান ও বাম। উভয় ধমনী আবার দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, তারপর আরও অনেকগুলি শাখায় এবং সর্বশেষে হার্টের পেশী মধ্যস্থিত ছোট ছোট ধমনী ও জালক (capillary) এসে শেষ হয়েছে। তারপর বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে

হৃদযন্ত্রে রক্ত প্রথমে সংগৃহীত হয় এবং একটি বৃহৎ রক্তবাহী নালীতে (coronary sinus) ফিরে আসে। এই করোনারী সাইনাস যথা সময়ে ডান অলিন্দে প্রবিষ্ট হয়। হৃদযন্ত্রের শিরার দিকটা হলো ডান অলিন্দ। বাম অলিন্দের হলো সংগ্রহণ প্রকোষ্ঠ।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো হৃদযন্ত্রে রক্তের প্রবাহ সেই সময় বেশি ঘটে যখন হৃদযন্ত্রটি শিথিল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাকে বলে ডায়াস্টোল (diastole); হৃদযন্ত্রটি যখন সংকুচিত অবস্থায় থাকে তখন সেখানে রক্ত প্রবাহিত হয় না। একে বলে সিসটোল (systole)। এর কারণ হলো, সর্বাধিক সংকোচনের সময় হৃদ-যন্ত্রের মাংসপেশীর মধ্যস্থিত চাপ করোনারী ধমনীগুলির মধ্যস্থিত চাপের থেকে বেশি থাকে। যার ফলে রক্তের অবাধ প্রবাহ সামান্য সময়ের জন্য থেমে থাকে। সেই কারণে, হার্টের শিথিল অবস্থায় যে চাপ লক্ষিত হয় সেইটি হলো হৃদযন্ত্রের রক্ত প্রবাহের এক গুরুত্ব-পূর্ণ নিয়ামক। একে বলা হয় করোনারী রক্ত প্রবাহ (coronary blood flow) যা কিনা ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্রে (blood-pressure) ডায়াস্টলিক প্রবাহ (diastolic pressure) হিসেবে ধরা হয়। ব্লাড প্রেসার যন্ত্রে যেটা প্রথম সংখ্যা হিসেবে ধরা হয় (অর্থাৎ সিসটোলিক প্রেসার systolic pressure) সেটা নির্দেশ করে যে যখন হৃদযন্ত্র সংকোচন করে ও রক্ত নিক্ষেপণ করে তখন, রক্তবাহী নলের অন্তবর্তী চাপ বা (pressure) সর্বোচ্চ সীমায় শীর্ষ (peak) পর্যায়ে থাকে। যে কোনো কারণেই হোক যদি ডায়াসলিক রক্তচাপ বেশিমাত্রায় কম হয় তবে হৃদযন্ত্রে রক্তের প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যার ফলে অক্সিজেন ঘাটতির সম্ভাবনা থেকে যায়। অন্যদিকে, অত্যন্ত বেশিমাত্রায় ডায়াস্টোলে রক্তচাপ সমান ক্ষতি-কারক, যেহেতু এর ফলে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতার ওপর বেশি চাপ পড়ে কারণ গোটা শরীরের রক্তবাহী নালীকায় রক্ত সংবহন করার সময় এমত ক্ষেত্রে তাকে ক্রমবর্ধমান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চ ডায়াস্টলিক চাপকে বলা হয় উচ্চরক্তচাপ (hypertension) যেটা হার্টের অসুখের অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি।

হৃদযন্ত্রের পেশীতে রক্ত সংবহন বা প্রবাহ একটি জটিল ব্যবস্থার

মাধ্যমে সংঘটিত হয়। প্রথমে নার্ভতন্ত্রের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক বাহিত ঘাত (impulse) বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র করোনারী ধমনীগুলিতে পেঁছায়—এমন একটা সময় যখা সমানভাবে জটিল এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া উপস্থিত থাকে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বয়ংনিয়ামক (autoregulation)। এই স্বয়ংনিয়ন্ত্রণের কাজ হলো হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর ক্ষমতাকে সাহায্য করা যাতে সে দ্রুত সেই সব জিনিস মেশাতে পারে যার সাহায্যে ছোট রক্তবহানালীগুলি স্ফীত হতে পারে যখনই তাদের শরীরের কোনও নির্দিষ্ট যন্ত্রে অধিকতর অক্সিজেন পেঁছে দেবার দরকার পড়ে। যে কোনো কারণেই হোক যখনই এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করতে না পারে, তখনই রোগের প্রধান কারণ হলো অ্যাথেরোসেক্লরোসিস—যা হঠাৎ একদিনে হয় না বরং ধীরে ধীরে গোপনে বেড়ে চলে এবং অবশেষে প্রকটিত হয়।

এই রোগটা কেন হয়? দুঃখের বিষয়—এর কোন সহজ সরল উত্তর নেই। তবে এটা সত্য যে এই রোগে ধমনী (arterial tree) জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ এই রোগে মহাধমনী (aorta) ও বৃহৎ ও মধ্যাকৃতির ধমনীগুলি প্রভাবিত হয়। যদিও উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এর একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, দেখা গেছে যে স্বাভাবিক রক্তচাপ থাকাকালীন অবস্থায় এই রোগ অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকে।*

অ্যাথেরোসেক্লরোসিস-এর বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝতে গেলে আমাদের কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন মানবদেহে মেদ বা স্নেহ-বস্তু (fat) এবং কোলেস্টেরল (cholesterol)-এর ভূমিকা। স্নেহ-বস্তু হলো শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস। এর রাসায়নিক আকৃতি এক দীর্ঘ-শৃঙ্খলাকার (long-chain) ফ্যাটি অ্যাসিড অণু (fatty acid molecules)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কি পরিমাণ নির্বাধ অক্সিজেন (free oxygen bonds) ফ্যাটি অ্যাসিড অণুতে সংযুক্ত থাকে সেই হিসাব অনুযায়ী মেদ বা fats-এর শ্রেণীকরণ, করা হয়; যথা সম্পৃক্ত মেদ (saturated fats) অংশ, আংশিক সম্পৃক্ত মেদ (partly saturated fats), বা অসম্পৃক্ত মেদ (unsaturated fats)। সম্পৃক্ত মেদ-এ কোনো নির্বাধ অক্সিজেন বন্ধনী (free oxygen bonds) থাকে না কারণ হাইড্রোজেন পরমাণু-

গুলি তাদের স্থানচ্যুত করে (মাংস, মাখন ইত্যাদি সংপৃক্ত মেদ-এর উদাহরণ)। অ-সংপৃক্ত মেদ পাওয়া যায় উদ্ভিজ্জ-তৈলে (vegetable oils) ও মৎস্য-তৈলে (fish oils)। অংশত সংপৃক্ত মেদ পাওয়া যায় জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তৈল হতে। মেদ যত সংপৃক্ত (saturated) হবে, ততই তার তরলতা কমবে। অন্ত্রের মাধ্যমে বিশোধিত হয়ে মেদ লসিকানালীতে (lymph vessels) আসে এবং সেখান থেকে শিরাতন্ত্রে উপনীত হলে সে ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride)-এ রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন অবস্থায় ট্রাইগ্লিসারাইড প্রবেশ করে শরীরের রক্ত সংবহন ব্যবস্থায় বা সেখান থেকে যকৃতে (liver)। যকৃৎ-এর কাজ হলো মেদকে শক্তির উৎস হিসেবে রূপান্তর করা, উদ্বৃত্ত মেদকে বিভিন্ন শারীরিক কোষ-কলায় মজুত শক্তি হিসেবে ধরে রাখা। রক্ত প্রবাহ থেকে অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড দূর করা হলো যকৃৎ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং মজুত অংশ ব্যবহৃত হয় শক্তির উৎস হিসেবে। কিন্তু যখন শরীরে শক্তির উৎস অত্যধিক, তখন মজুত করা মেদ যথাযথ ব্যবহৃত হয় না এবং উদ্বৃত্ত ট্রাইগ্লিসারাইড থাকার ফলে প্রয়োজনের তুলনায় শরীরের ওজন বেড়ে যায়।

শরীর গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরল শরীরের প্রায় সব কোষেই বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, পিত্ত-লবণ (bile salts), যা কি না হজমের কাজে খুবই সাহায্য করে, তৈরি হয় কোলেস্টেরল থেকে। কিন্তু যদিও শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরাসরি কোনো কোনো খাদ্য থেকে শরীর কোলেস্টেরল গ্রহণ করে। কিন্তু যকৃৎ ও অন্যান্য কোষে শরীর নিজস্ব কোলেস্টেরলও প্রস্তুত করে। রক্তপ্রবাহে বাহিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছায়, যেমন অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (adrenal gland), পিটুইটারি (pituitary) ইত্যাদি যেখানে সে রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন হরমোন (hormone)-এ। হরমোন হলো নির্দিষ্ট কোষ-কর্মের নিয়ামক (regulators of specific cell functions)। কিছু ব্যতিরেক বাদ দিলে, মানবদেহের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা মোটামুটি স্থিরীকৃত থাকে। রক্তে বাহিত

অবস্থায় কোলেস্টেরল রক্তে দ্রবীভূত (dissolved) হয় ; তখন এর মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্টাবলী (physical characteristics) পরিলক্ষিত হয়। যাত্রাপথে কোলেস্টেরল-এর কিছু অংশ রক্তবহা নালীর সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত দেওয়ালে পরিশ্রুত (filtered) হয়ে ক্ষুদ্র লসিকা বাহিকায় (small lymph vessels) উপস্থিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ঘনত্ব বা কেন্দ্রীভবন (concentration) এবং ধমনীর অভ্যন্তরভাগের চাপ (অর্থাৎ রক্তচাপের উচ্চতা)। রক্তে কোলেস্টেরলের ঘনত্ব যত বাড়বে, ততই রক্তবহা নালীর দেওয়ালের মাধ্যমে কোলেস্টেরল পরিস্রুত হতে থাকবে। এবং রক্তের চাপ যত বাড়বে, তত বেশি শক্তি ক্ষয়িত হবে দেওয়াল থেকে কোলেস্টেরলকে সরিয়ে ফেলতে। স্নায়ুপ্রান্তের সংঘাতের মাধ্যমে তা জানা যায় এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে যে যন্ত্রণা হয় তাকে সাধারণত বলা হয় এ্যান্‌জাইনা (angina)।

উপরের আলোচনা থেকে অন্ততঃ এটুকু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে হৃদযন্ত্র হলো একটি জীবনদায়ী অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর মেসিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হৃদরোগের কারণসমূহ

(The Causes of Heart Diseases)

হৃদযন্ত্র ও রক্তবহা নালিকা (heart and blood Vessels) একত্রে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে শরীরের প্রতিটি যন্ত্রে রক্ত সংবহন ও সরবরাহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যেহেতু এই ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য, তাই এই ব্যবস্থার যে কোনো অংশের ক্ষয়ক্ষতি যা রোগ বা ত্রুটিপূর্ণ কাজ গোটা ব্যবস্থাটাকেই প্রভাবিত করে, এবং এর ফলে সামগ্রিক বিচারে রক্ত প্রবাহ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে এ সত্ত্বেও শরীরের এই যন্ত্রের সমন্বয় এবং ক্ষতি রোধ করার ক্ষমতা এমনই যে গোটা ব্যবস্থার কোন এক অংশের ত্রুটি (malfunction) দীর্ঘদিনযাবৎ সহ্য করতে পারে।

১. **Atherosclerosis (অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস)**

দেখা গেছে যে ইদানীং অধিকাংশ হৃৎঘটিত আবার যখন কোলেস্টেরলের মাত্রা কম এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে, তখন ধমনীর দেওয়াল থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় কোলেস্টেরল পরিস্রুত হয়ে লীম্ফ নালীতে পৌঁছায়। কোলেস্টেরলের মাত্রা যখন বেশি এবং রক্তচাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ধমনীর দেওয়ালের মাধ্যমে বেশি পরিমাণ কোলেস্টেরল পরিস্রুত হয়। কোনো ক্ষেত্রে, এই বর্ধিত পরিমাণ কোলেস্টেরল ধমনীর দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং কতকগুলি কেন্দ্রে ধমনীয় দেওয়ালকে অবরুদ্ধ (plug up) করে। প্রাথমিক অবস্থায় এই অবরুদ্ধ প্রক্রিয়ার শুধুমাত্র একটি মেদ স্তূপ পরিদর্শিত হয় ধমনীর দেওয়ালে। তারপর

যত দিন যায় অধিকতর পরিমাণ কোলেস্টেরল জমতে জমতে একটা অবরোধের (plug)-এর সৃষ্টি হয়। অবশেষে ধমনীর দেওয়ালের তন্তুর চারপাশে একটা প্রদাহকারী প্রতিক্রিয়া (inflammatory reaction)-র মাধ্যমে ওই অবরোধটি অ্যাথেরোসেক্লোরোটিক তকমায় (atherosclerotic plaque) রূপান্তরিত হয়। ধমনীতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে ও বক্রতার (divisions and curvatures) এই অ্যাথেরোস্ক্লোরোটিক তকমা অবস্থিত থাকে atheromatous plaque)।

এটা ঠিকই যে রক্ত বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরলের ঘনত্ব অ্যাথেরোস্ক্লেসিসের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি কারণ, যথা মধুমেহ (diabetes), হাইপোথাইরইডিজম (hypothyroidism) থাইরয়েডগ্রন্থির (thyroid) কম কর্মক্ষমতা) কোনো কোনো বৃক্ক-জনিত রোগ (certain kidney diseases) অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিসকে দ্রুততর করে। কারণ এই সব রোগ স্নেহবস্তুর বিপাককে প্রভাবিত করে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে ব্যক্তিভেদে কিছু পার্থক্য দেখা যায় কি ভাবে রক্তের মধ্যে স্নেহবস্তু ও কোলেস্টেরল প্রবহমান থাকে। স্নেহবস্তু ও কোলেস্টেরলকে বহন করে কিছু বিশেষ-ধরনের চর্বিযুক্ত প্রোটিন যাদের বলা হয় লাইপোপ্রোটিন (lipoproteins), এবং এই লাইপোপ্রোটিনের আকার বড় না ছোট তা নির্ভর করে প্রোটিন অণুর ওপর। ছোট লাইপোপ্রোটিনকে বলা হয় কম-ঘণক লাইপোপ্রোটিন (low density lipoprotein বা HDL) বৃহৎ উচ্চ-ঘনক লাইপোপ্রোটিনকে বলা হয় highdensity lipoprotein বা HDL। খুবই কম-ঘনক লাইপোপ্রোটিন ধমনীর দেওয়ালে কোলেস্টেরলের পরিমাণ অধিকতর বাড়ায়। এবং নিঃসন্দেহে অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিসকে ত্বরান্বিত করে। দেখা গেছে যে বংশগতভাবে কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে LDL-র প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় যার ফলে অচিরেই তাঁরা অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিসের শিকার হন।

ধূমপান হলো আর একটি হেতু যেখানে ঝুঁকি থাকে, কারণ

দেখা গেছে যে তাদের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি ধমনী শক্ত (hardening of arteries) হয়ে যায় এবং এর ফলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের তকমা দ্রুত সৃষ্টি হয়। মজার কথা হলো মাত্রাধিক ধূমপায়ীদের যদি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা (cholesterol level) কমও থাকে তাহলেও তাদের দেহে ধমনীর কাঠিন্য দেখা যায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে নিকোটিন (nicotine) কার্বনমনোক্সাইড (carbon monoxide) এবং জ্বলন্ত অবস্থায় অন্যান্য গ্যাস; তাছাড়া থাকে আলকাতরা (tar), অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু, এবং সামান্য পরিমাণে বিকীরণ বস্তু (radio-active materials)। এর মধ্যে কোন্ পদার্থটি অ্যাথেরো-স্ক্লেরোসিস এর জন্য দায়ী তা এখনও নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হয়নি। নিকোটিন হলো একটি পদার্থ (vasoactive drug) যা সংবহন ব্যবস্থায় বিস্তার করে ক্ষুদ্র রক্তবাহীনালিকাকে রুদ্ধ করে, ফলে রক্তচাপ কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার লিভার বা সব যকৃতের যে ক্ষমতা থাকে রক্তে অধিকতর স্নেহবস্তু বা ট্রাইগ্লিসারাইডকে অপসরণ করার (বিশেষ করে কোনো কিছু খাবার পর) সেই ক্ষমতা নিকোটিনের প্রভাবে বিলম্বিত হয়। ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেন লোহিত কণার হেমোগ্লোবিন অণুর (haemoglobin molecule) সঙ্গে সম্পৃক্ত। কার্বনমনোক্সাইড ও হেমোগ্লোবিন অণুর—সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে ফলে ধূমপানের-এর দরুন অক্সিজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটে যায়। হেমো-গ্লোবিনের এর ঝোঁক কার্বনমনোক্সাইডের এর প্রতি 250 গুণ বেশি থাকার ফলে অক্সিজেন পর্যুদস্ত হয়। এবং এর ফলে যে কার্বনমনোক্সাইড সম্পৃক্ত হেমোগ্লোবিন সৃষ্টি হয় তা কোষের শ্রীবৃদ্ধিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। রক্তে যদি খুব বেশি কার্বন-মনোক্সাইড থাকে তবে রক্তবাহীনালিকার ভিতরকার দেওয়াল ক্লোরেস্টেরলকে পরিস্রুত করার কাজটা দীর্ঘায়িত করতে পারে না। এর ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলির দেওয়ালে কোলেস্টেরল কার্বন মনোক্সাইডের সাহায্যে, দ্রুত প্রবেশ করে তকমা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

দুঃখের বিষয় অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিস চট্ করে নির্ণয় করা যায় না বা ধরা যায় না। যতক্ষণ না সে নিজে থেকে এর লক্ষণগুলিকে প্রকাশ করে। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই অ্যাথেরোসক্লেরোসিস একটি বিধ্বংসী রোগ। কারণ হার্টঅ্যাটাক, স্ট্রোক, বৃক্কের (kidney) রোগ ও ক্ষতি ইত্যাদি অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিসের শেষ পর্যায়।

২. রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিস (Rheumatic Heart Desease)

হৃদরোগের দ্বিতীয় প্রধানতম কারণ হলো রিউম্যাটিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিভার। গলায় এক ধরনের বীজাণুর সংক্রমণ থেকে এর উৎপত্তি—বেটা হেমোলিটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস্ (Beta hemolytic streptococcus) নামক এক বীজাণু (bacteria) এর জন্য মূলত দায়ী। প্রকৃতপক্ষে এই সংক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো রিউম্যাটিক ফিভার। হার্ট এবং সংবহণ তন্ত্রের যে সূক্ষ্ম ভিতরের দেওয়াল বা পর্দা (inner lining) আছে সেটি বীজাণুর প্রোটিন ঘটিত বিষের (protein toxins) সংস্পর্শে ক্রিয়াশীল হওয়ার দরুন স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণ হয়। এর ফলে প্রধানত হার্টের কপাটিকার চতুষ্পার্শস্থিত জায়গায় এবং কখনও কখনও হার্ট মাসুলের ক্ষুদ্র রক্ত বাহিকায়, এমনকি কখনও হার্টের ওপরকার লাইনিঙে একটি প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রদাহ প্রশমন করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই কপাটিকার (valve) স্থিতিস্থাপকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একবার যদি অধিবিষ (toxin) কপাটিকাগুলিকে ক্রিয়াশীল (sensitized) করে থাকে, তাহলে বারংবার সংক্রমণ ঘটাতে পারে যার ফলে নূতনতর প্রদাহ (inflammation), ক্ষত (scarring) ও বিকৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সাধারণত যদি স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণ অনধিক দশদিন চিকিৎসার পরও ঠিকমতো প্রশমিত না হয় তাহলে রিউম্যাটিক ফিভার অবধারিত হয়ে পড়ে। প্রধানত শিশুদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। দুঃস্থ শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায়। স্ট্রেপ্টোকক্কাস্ অধিবিষের (streptococcus toxins) আরও কয়েকটি

প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে ; যেমন, স্কারলেট ফিভার (শিশু ও বয়স্ক উভয় ক্ষেত্রেই), বৃক্ক প্রদাহ (kidney inflammation), গ্লমারু-লোনেফ্রাইটিস (glomerulonephritis)। স্কারলেট্ কিভাবে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়—(chronic valvular disease affecting the blood circulation)। হৃদযন্ত্রের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ এতে উত্তরোত্তর রক্তচাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বলতে গেলে রিউম্যাটিক ফিভার, স্কারলেট ফিভার ও গ্লমারুলোনেফ-রাইটিস (কিডনীর সংক্রমণ) একই পর্যায়ভুক্ত, কারণ সর্বক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কারণ হলো বেটা হেমোলিটিক স্ট্রেপটোকক্কাস নামক বীজাণুর ভূমিকা। যদি যথাযথ বীজাণু বিধ্বংসী ওষুধ (anti-biotics) প্রয়োগে বিশেষত পেনিসিলিন (penicillin) সংক্রমণ প্রাথমিক পর্যায়ে দূরীভূত করা যায়—তাহলে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা ও কিডনীর স্টোন প্রদাহ রুদ্ধ করা যায়।

৩. জন্মগত হার্টের অসুখ (Coagenital Heart Disease)

যখন হৃদযন্ত্র অথবা বৃহৎ রক্তবাহী নলগুলি জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই স্বাভাবিক বর্ধন (development) হয় তখনই এই অসুখের সূত্রপাত ঘটে। এই ধরণের অসুখের কারণ এবং অসুখটির বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। কিছুটা বংশগতকারণ ও কিছুটা অন্যান্য কারণের জন্য এই অসুখটি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রে যে জন্মগত ত্রুটি দেখা যায় তা শুধুমাত্র সামগ্রিক জন্মগত বৈসাদৃশ্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র ; এবং এই বৈসাদৃশ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় নার্ভকেন্দ্র (central nervous centre) এবং অন্যান্য তন্ত্রও জড়িত থাকে যা কিনা জন্ম-উৎপত্তিগত অস্বাভাবিকতার (genetic abnormality) দরুন হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভধারণ অবস্থায় যদি মায়ের শরীরে কোনো বিপাকীয় ত্রুটি (metabolic dis-order) যেমন মধুমেহ, হাইপোথাইরয়ডিজম) তাহলে শিশুর জন্ম-কালে বা তৎপূর্বেই হৃদযন্ত্রের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এটা এখন পরীক্ষিত সত্য যে গর্ভধারণ অবস্থায় যদি মায়ের শরীরে কোনো গুরুতর সংক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হয় যেমন (German measles)

জার্মান মিজলস Rubella ও অন্যান্য ভাইরাস আক্রমণ তাহলে শিশুর শরীরে জন্মগতভাবে হৃদপিণ্ডে ত্রুটির সম্ভাবনা প্রবল থাকে। কারণ এইসব ভাইরাস (virus) ভ্রূণের উন্নতি ব্যাহত করে, যার ফলে হৃৎপিন্ড ও সংবহনতন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশের ক্ষতি হয়। আজকাল শল্যচিকিৎসায় সাহায্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ত্রুটি দূরীভূত করা যায়। তাই হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটির আগে থেকে ধরা না হলে শল্যচিকিৎসাও অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থ হয়। হৃদযন্ত্রের প্রাথমিক (জন্মগত) ত্রুটির সঙ্গে যদি অন্যান্য ত্রুটি জড়িত থাকে (যেমন পালমোনারি ভ্যাসকুলার ড্যামেজ বা ফুসফুসে রক্তবাহিকার ক্ষতি) সে ক্ষেত্রে রোগটি জটিল আকার ধারণ করে এবং প্রায়ই চিকিৎসায় কোনে সুফল পাওয়া যায় না।

হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটির লক্ষ্মণগুলি প্রথম দিকে লক্ষিত নাও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় খুবই। যেমন অসম্পৃক্ত রক্ত (desaturated blood) ফুসফুসের মাধ্যমে প্রবেশ না করে রক্ত সঞ্চলনে (circulation) প্রবিষ্ট হয় তখন যে ত্রুটি উদ্ভূত হয় তার নাম কেন্দ্রিক নীলবর্ণময়তা (central cyanosis)। এই ত্রুটির কারণ হলো, এক মাসের মধ্যে (neonate) মহাধমনীর পলান্তকরণ (transporition of great arteories), অর্থাৎ দক্ষিণ নিলয় থেকে অ্যাওটা (aorta) এবং বাম নিলয় থেকে পালমোনারি ধমনী নির্গত হয়। বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে মুখ ও শরীর নীলাভ হয়ে যাওয়ার কারণ হলো নিলয় ব্যবধায়ক ত্রুটি (ventricular septal defect) যার সঙ্গে জড়িত থাকে ফুস্‌ফুসের অপ্রসারতা (pulmonary stenosis)। ডাক্তারী ভাষায় এই রোগটির নাম (Fallot's tetralogy) সায়ানোসিসের আরও একটি কারণ ফুসফুসে রক্তবাহী নালিকার—ত্রুটি (Pulmonary vasculas disease বা আইসেনমেনজারস সিনড্রোম)। এক্ষেত্রে ফুসফুসে উচ্চ রক্তচাপ ও বিপরীতমুখী গতি (reversed shunt) তৎসহ নিলয় অথবা অলিন্দ ব্যবধায়ক ত্রুটি (ventnicular বা atrial septal defect) দেখা যায়।

যাই হোক, দেখা গেছে যে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি প্রায় ক্ষেত্রেই সংশোধন করা যায় যদি সেই ত্রুটি সময়ে ধরা পড়ে। নচেৎ নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৪. হৃৎ-পেশীর রোগ (Heart muscle disease)

হৃৎ-পেশীর রোগের ফলে দ্রুত ও বারংবার (acute and chronic) হৃৎযন্ত্রের কার্যকারিতা অস্বাভাবিক ভাবে কমে যেতে পারে বা হার্ট ফেলিওর (heart failure) ঘটে। এই রোগের কারণসমূহে অনেক জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উপাদান জড়িত। তবে হৃদয়ন্ত্রের অপরাপর রোগ অপেক্ষা এই রোগের বহুলতা বরং একটু কম।

হৃৎ-পেশীর রোগে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ভাইরাসজনিত সংক্রমণ জড়িত থাকে, যার ফলে পেশীতে প্রদাহের (inflammation) সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যবশত প্রায়ই অন্যান্য বিশেষ ক্ষতি ব্যতিরেকেই পেশীর প্রদাহ প্রশমন করা যায়। তবে এটা ঠিকই যে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন পেশী-দুর্বলতা ও তজ্জনিত হার্ট ফেলিওরও ঘটে থাকে। যেহেতু হৃৎ-পেশী হৃদযন্ত্রের ক্ষমতার অন্যতম একটি উৎস তাই এর দুর্বলতা বহুলাংশে সেই ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত করে যার ফলে হৃদযন্ত্রের রক্ত সংগ্রহ ও সংবহন ক্ষমতা কমে যায়।

যে সব কারণ আপাতত জানা গেছে তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো দীর্ঘকালব্যাপী মদ্যপানাসক্তি (chronic alcoholism)। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে নিয়মিত মদ্যপান, তা সে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে হলেও, শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র বা শরীরের নানা যন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় নার্ভব্যবস্থাকে (central nervous system), মস্তিষ্ককে, হৃদযন্ত্রকে, যকৃৎকে ও মূত্রবৃক্ককে। এটা পরীক্ষালব্ধ সত্য যে শুধুমাত্র ২ আউন্স হুইস্কি জাতীয় সামান্যভাবে হৃৎ-পেশীর কর্মক্ষমতা কমে যায় আবার কিছু পরে সেই ক্ষমতা পুনর্বার ফিরে পায়। কিন্তু বারবার দীর্ঘকালীন পর্যায়ে এমন চলতে থাকলে হৃৎ-পেশীর দুর্বলতা ক্রনিক (chronic) পর্যায়ে চলে গিয়ে হার্ট ফেলিওর-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘকালীন

মদ্যপানজনিত হৃৎ-পেশীর রোগের নাম মায়োকার্ডিওপ্যাথি (myocardiopathy)। তাই হৃৎ-বিশারদের মতে, হৃৎ-পেশীর ক্ষতির সংগে জড়িত আছে অনেক ধরনের বিষ, যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো মদ "Heart muscle damage (is) associated with a variety of toxin, of which the most important is alcohol"। সুরাসক্তির (alcoholism) সংগে সংগে যদি বর্তমান থাকে হৃদযন্ত্রের কোনো আনুষঙ্গিক ত্রুটি, যেমন হৃদযন্ত্রের কপাটিকার অসুখ বা হৃদযন্ত্রের কপাটিকার কোন ত্রুটি, অথবা কোনো বিপাকীয় ত্রুটি (metabolic disorder) যেমন ডায়াবিটিস, সে ক্ষেত্রে এই হৃৎ-পেশীজনিত রোগ আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫. উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্টের অসুখ
(Hypertension and heart disease)

একটি সুস্থ সবল হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা (cardiac output) শারীরিক পরিশ্রম ও শারীরিক বিশ্রামকালীন অবস্থার ব্যবধানে পাঁচগুণ পরিবর্তিত হতে পারে রক্তচাপের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, হার্ট যদি সুস্থ সবল থাকে শারীরিক পরিশ্রমের সময়, সিস্টোলিক (systolic) ও ডায়াস্টোলিক (diastolic) রক্তচাপের গড় অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু উচ্চ রক্তচাপে (high blood pressure বা hypertension) রক্তবাহী নলের মধ্যে রক্তসঞ্চলন বর্ধিত হারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে হাইপারটেনশনের প্রাথমিক পর্যায়ে, যদিও রক্তচাপ শরীরের বিশ্রামকালীন অবস্থায় মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু শরীরের পরিশ্রমকালীন অবস্থায় সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক, উভয় রক্তচাপই বেড়ে যায় এবং এর ফলে রক্তচাপের গড় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, এই সময় প্রাথমিক ভাবে শরীর বর্ধিত হারে রক্ত সঞ্চলন-জনিত ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার ক্ষমতা হারায়। আবার যখন বিশ্রামকালীন অবস্থায় রক্তচাপ বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে রক্তবাহী নালিকায় রক্ত সঞ্চালনে বাধা কমবেশি বরাবরের জন্য বর্ধিত হয়। স্টেবল হাইপারটেনশনে (instable hyper-

tension) এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই চিরস্থায়ী বর্ধনের ফলে হার্টের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, কারণ এখন তাকে শরীরের সমস্ত জায়গায় রক্ত সঞ্চালনের নিমিত্ত বিশ্রামকালীন অবস্থাতেও অধিকতর কাজ করতে হয়। এবং সোজা কথায়, সেই কারণেই অচিরেই হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। করোনারী হার্ট ডিজিজ (coronary heart disease)-এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম হলো হাইপারটেনশন। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে হাইপারটেনশনের ফলে ধমনীর কাঠিন্য বা হার্ডেনিঙ অফ দি আর্টারিজ (arteriosclerosis), স্ট্রোক, কিডনীর অসুখ, শরীরের প্রত্যন্ত দেশে (extremities) ও অন্যান্য অঙ্গের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনে বাধা ইত্যাদি ঘটে থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে, হাইপারটেনশনে শুধুমাত্র হার্টের ওপরেই অতিরিক্ত চাপ পড়ে হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এই অসুখে রক্তবাহী নালিকায় যথেষ্ট ক্ষতির সৃষ্টি হয়।

একটা কৌতূহল আমাদের মনে আসতেই পারে, যদি একটি সুস্থ সবল দেহে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত নিয়মমাফিক হয়, তাহলে এটা অবশ্যই সত্য যে উচ্চ রক্তচাপে এই নিয়ন্ত্রণে কিছু একটা ত্রুটি বিদ্যমান। তাই যদি হয় তবে আমাদের দেখতে হবে কি কি উপাদান (factors) এই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জড়িত থাকে।

রক্তবহা নালীর ভিতরের ব্যাসকে চরিত্রগতভাবে বৈশিষ্ট্য দান বা সংপরিবর্তন করে বিভিন্ন নার্ভ ইম্পালস্। এই নার্ভ ইম্পালসগুলি আসে কেন্দ্রীয় নার্ভ ব্যবস্থা, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ (adrenal glands), কিডনী ও সম্ভবত অন্যান্য গ্রন্থি থেকে নির্গত রক্তবাহিত রাসায়নিক পদার্থ থেকে। এই প্রক্রিয়ায়, শরীরের চাহিদা অনুযায়ী, রক্তবহানালীগুলি হয় ছোট হয়ে যায় (constrict) নতুবা বেড়ে যায় (dilate)। নার্ভতন্ত্র ও কিডনীতে রক্তচাপের মাত্রার হিসেব অনুযায়ী তারা সেই মতো ব্যবহার (response) করে। সহজ কথায় যখন রক্তচাপ কমে সঙ্গে সঙ্গে রক্তবহানালীকে নার্ভ ব্যবস্থার মাধ্যমে সঙ্কুচিত বা (constrict) ছোট করার জন্য নার্ভ ইম্পালস্গুলিও কমে আসে। এবং সেই একই সময়ে কিডনী থেকে নির্গত রাসায়নিক

সঙ্কোচন (constriction) রক্তবহানালীগুলিতে পেঁছায়, যার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়।

যখন এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে রক্তচাপের দ্রুত পরিবর্তমানতা ঠিক (adjust) করা যায়, তখন অপর এক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পরিবর্তমানতা দীর্ঘায়িত হয় এবং এই অপর প্রক্রিয়াটি শরীরকে রক্ত ও তন্তুতে (tissue) যে পরিমাণ জল থাকে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে। জলভর্তি রক্ত ও তন্তুসমূহকে বলা হয় ব্লাড ভল্যুম। স্পষ্টত বোঝাই যাচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপে এই সব প্রক্রিয়া দারুণ ব্যাহত হয় এবং এর ফলে ঘটনা পরম্পরায় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের উচ্চ রক্তচাপকে বলা হয় প্রাইমারি হাইপার-টেনশন। (যেখানে প্রত্যক্ষ কারণ অজ্ঞাত থাকে।) যেখানে উচ্চ রক্তচাপের গোড়ার কারণগুলি (initiating factors) জানা যায় সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিডনীতে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। (এই সময় কিডনী-অভিমুখী ধমনী সংকুচিত হয়ে যায় (renal artery stenosis) আবার অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে টিউমার হলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। কারণ এই সময় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে অতিরিক্ত পরিমাণ এক প্রকার স্টেরয়েড হর্মোন (aldostenone) উৎপন্ন হয়।

ইস্কিমিক্ হার্ট ডিজিজ (IHD বা ischaemic heart disease)-এর একটি প্রধান আশঙ্কাজনিত কারণ হলো হাইপার-টেনশন। প্রথমে এর ফলে যে উপসর্গ দেখা যায় তার নাম বাম নিলয়ের প্রসার (left ventricular hypertrophy)। এবং এর সঙ্গে যদি করোনারি ডিজিজ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে বুকে ব্যথা (chest pain বা অ্যানজাইনা) অনুভূত হয়। পরে এর ফলে লেফট্ ভেন্ট্রিকিউলার ফেলিওর শুরু হয়। তবে হাইপারটেনশনে শুধুমাত্র হার্টের অসুখই হয় না, এর ফলে কেন্দ্রীয় নার্ভ ব্যবস্থা (central nervous system বা CNS), অক্ষিপট (retina), ও বৃক্কের (kidneys) রোগও হয়।

৬. করোনারি হার্ট ডিজিজ (Coronary Heart Disease)

এই রোগটির সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে 'করোনারি' কথাটির অর্থ পরিষ্কার করে বলে নেওয়া দরকার। 'করোনারি' কথাটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন করোনারি থ্রম্বোসিস, করোনারি ইন্‌সাফিসিয়েন্সি ইত্যাদি। তেমনই 'করোনারি' বলতে সেই নির্দিষ্ট অবস্থার কথাই বোঝায় যখন মহা ধমনী (aorta) থেকে বেরিয়ে আসা হৃৎ-পেশীতে রক্ত সরবরাহকারী দুটো ধমনীর (arteries) যে কোন একটির অথবা দুটিরই রোগ। যেমন, করোনারি আর্টারিগুলি যদি মায়োকার্ডিয়ামে (myocardium—muscular substance of the heart) প্রয়োজন মতো রক্ত সরবরাহ করতে অক্ষম হয়, তখন যে উপসর্গের সৃষ্টি হয় তার নাম অ্যানজাইনা পেক্টোরিস (angina pectoris) বা বুকে অসহ্য ব্যথা।

করোনারী ধমনী বা করোনারী আর্টারির ক্ষতিজনিত হৃদরোগের নাম করোনারী হার্ট ডিজিজ (coronary heart disease)। এই রোগের সর্বপ্রধান কারণ হলো ধমনীগুলির কাঠিন্যপ্রাপ্তি (hardening of the arteries)। যখন ব্লাড ভেসলসগুলির দেওয়ালে চর্বিজাতীয় জিনিস জমে থাকে তখনই এই উপসর্গের সৃষ্টি হয় যার ফলে রক্ত সরবরাহের কাজ ব্যাহত হয়। করোনারি ধমনীগুলোর কাঠিন্যজনিত রোগটির নাম অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis)। এ ক্ষেত্রে করোনারি ধমনীগুলির মধ্যে জমা হতে থাকে এক ধরনের চর্বিজাতীয় কঠিন বস্তু (plaque)। এই রোগটির সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৭. অ্যানজাইনা পেক্টোরিস (Angina Pectoris)

অ্যানজাইনা পেক্টোরিস ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ বুকে ব্যথা। (angina—pain বা ব্যথা, pectoris—বুক, chest ; angina of the chest or breast)। হৃৎ-পেশীতে হঠাৎ রক্ত সরবরাহ কমে গেলে বুকে ও বাম বাহুতে প্রচণ্ড ও

বারংবার ব্যথা অনুভূত হয়। হৃৎবিশারদদের মধ্যে অ্যানজাইনা পেক্টোরিসকে একটি হৃদ্‌রোগ বলার চাইতে হৃদরোগের কয়েকটি লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। সঠিকভাবে বলতে গেলে ট্র্যানসিয়েন্ট মায়োকার্ডিয়াল ইস্‌কিমিয়া (transient myocardial ischaemia) অর্থাৎ মায়োকার্ডিয়ামে প্রয়োজনের তুলনায় কম রক্ত সরবরাহ হেতু যে অস্বস্তি হয় তারই একটি প্রকাশ অ্যানজাইনা পেক্টোরিস।

অ্যানজাইনা পেক্টোরিসে বুকের ঠিক মাঝখানে দমবন্ধ হওয়া একটা অনুভূতি হয়। মনে হয় একটা ব্যথা যেন চেপে বসছে। বুকের মাঝখানের হাড়টিতে (স্টার্ণাম বা ব্রেস্টবোন sternum or breastbone) অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের রুগী বারবার হাত রেখে তার ব্যথার যন্ত্রণা বোঝাবার চেষ্টা করে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলে ব্যথাটা চলে যায়; আবার পরিশ্রম করলে, বেশি হাঁটলে বা সিঁড়ি ভাঙলে ব্যথাটা ফিরে আসে। আবার কখনো কখনো অনেক অ্যানজাইনার রুগী শোওয়া অবস্থাতেও ব্যথার অনুভূতি টের পায় (একে বলে অ্যানজাইনা ডেকুবিটাস angina decubitus)। তা সে যাই হোক করোনারি ধমনীগুলির স্প্যাজম্‌ বা সংকোচনের ফলে অ্যানজাইনা কখন যে হবে আর কখন যে হবে না তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। শুধুমাত্র বুকের মাঝখানের হাড়টিতেই নয় angina ছড়িয়ে পড়ে বাম বাহুতে (কখনো কখনো উভয় বাহুতেই), ঘাড়ে, চোয়ালে এবং কদাচিৎ অংশফলকে (scapula)। আবার এও দেখা গেছে যে স্টারনামে ব্যথার অনুভূতি নেই কিন্তু উপরোক্ত অন্যান্য অংশে রয়েছে। পরিশ্রমে বেড়ে যায়, বিশ্রাম নিলে কমে যায় বা দূরীভূত হয়, এই রকম ব্যথা প্রকৃতপক্ষেই অ্যানজাইনা পেক্টোরিস কি না তা সঠিক অনুধাবন করতে গেলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি (elcctrocardiography or E.C.G) করা উচিত। যদি দেখা যায় যে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস হয়েছে এবং গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট-জাতীয় ওষুধে (যেমন sorbitrate) ব্যথার প্রশমন হচ্ছে তাহলে এই ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়। ইকোকার্ডিওগ্র্যাফির সাহায্যে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থেকে থাকে তাহলে সেটা পরিলক্ষিত হবে (যেমন,

নিলয় বা ventricle-এর কর্মক্ষমতা কেমন ইত্যাদি)। আর করোনারি ধমনী (artery) কতকটা ছোট হয়ে গেছে (যার ফলে রক্ত সরবরাহ কম হচ্ছে) সেটার সম্বন্ধে বিশদ খবর পাওয়া যাবে করোনারি আর্টেরিওগ্র্যাফি (coronery arteriography) করলে। তবে সর্বক্ষেত্রে এটা করা হয় না। যদি পরবর্তী কোনো সময়ে বাইপাস অস্ত্রোপচার (bypass surgery) করার দরকার পড়ে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যেই সাধারণত করোনারি আর্টেরিওগ্র্যাফি করা হয়।

অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের তিনটি পর্যায়; প্রাথমিক পর্যায়ে, লক্ষণগুলির গুরুত্ব (severity) ও বিস্তৃতি (extent) সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া; দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিভিন্ন উপায়ে লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রিত করা; এবং তৃতীয় পর্যায়ে, উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে লক্ষণগুলির প্রশমণ করা যাতে আয়ুষ্কাল (life expectancy) আশানুরূপ বাড়ানো যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে নিদান (diagnosis), দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ (regulation), ও তৃতীয় পর্যায়ে চিকিৎসার (treatment) সঙ্গে আরোগ্য-সম্ভাবনা (prognosis) অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। রোগীকে তার অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন করার সঙ্গে তার প্রাত্যহিক জীবনযাপন ব্যাপারে উপদেশ দেওয়াও প্রয়োজন। এছাড়া চিকিৎসার সময় অ্যানজাইনার উপশমে সাধারণত তিন প্রকারের ওষুধ ব্যবহার করা হয়ঃ গ্লিসারিল্ নাইট্রেট, বেটা-ব্লকার ও ক্যালসিয়াম অ্যান্টাগনিস্টস্।

মোটের ওপর, নিদান বা ডায়াগ্নোসিসের সময় থেকে অ্যানজাইনা পেক্টোরিসে আক্রান্ত রুগীদের অর্ধেকের বেশির পাঁচ বছর পর্যন্ত, এবং এক তৃতীয়াংশের দশ বছর পর্যন্ত আয়ুষ্কাল এক্সপেনট্যান্সি থাকে। এই রোগের সঙ্গে যদি হার্টের আনুষঙ্গিক অন্যান্য দুর্বলতা (যেমন, মালটিপল কার্ডিয়াক ইনফারক্টস multiple cardiac infarcts) থাকে তবে সেই সব ক্ষেত্রে আরোগ্য সম্ভাবনা বা প্রোগ্নসিস্ আশাপ্রদ নয়।

৮. অনিয়মিত বা অস্থির অ্যান্‌জাইনা (Unstable Angina)

যখন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে হার্টে ইনফার্কশান (infarction—the development of an infarct) অনুপস্থিত কিন্তু অ্যান্‌জাইনা জনিত ব্যথা কখনো খুব বেশি অথবা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন অনিয়মিত বা আনস্টেবল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অনেক কারণের জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে ; যেমন করোনারি আথেরোস্ক্লেরোসিস, রক্তবাহী নালিকায় থ্রম্বাসের উপস্থিতি, বা করোনারি আর্টারির স্প্যাজম্‌। এই সব ক্ষেত্রে আক্রান্ত রুগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে এই সন্দেহে যে বোধ হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক হলেও হ'তে পারে।

তবে দেখা গেছে অধিকাংশ আনস্টেবল অ্যানজাইনায় আক্রান্ত রুগীর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিশ্রামের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সিডেশন (যাতে একটু তন্দ্রাভাব আসে), নাইট্রেট ও বেটা-অ্যাড্রেনারজিরকার ওষুধ প্রয়োগ (অবশ্যই বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে) করলে সুফল পাওয়া যায়। অ্যাস্‌পিরিন (আনুমানিক 300 mg/d) প্রয়োগে মায়োকার্ডিয়াল ইন্‌ফার্কশনের আশঙ্কা কমানো গেছে (এটা পরীক্ষিত ঘটনা) বোধ হয়, এই কারণে যে অ্যাস্‌পিরিন্‌ প্রয়োগে অ্যাণ্টিপ্লেটলেট জনিত সুফল পাওয়া যায়। আবার, ক্যালসিয়াম অ্যান্টাগনিস্টস্‌ (যেমন নিফিডিফিন) প্রয়োগও কার্যকর হতে দেখা গেছে। (ক্যাল্‌সিয়াম অ্যান্টাগনিস্টস' নামকরণ এই জন্যে যে এরা সূক্ষ্ম কোষ ঝিল্লীপথে, বিশেষত কার্ডিয়াক এট্রিয়াল সেলে, যে সব অতিরিক্ত সেলুলার ক্যালসিয়াম প্রবিষ্ট হয়ে অন্তঃস্থিত স্রোত মন্থর করে দেয়, তাদের দূরীভূত করে।) তবে এই সব ওষুধ প্রয়োগ করার পরও যদি অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না হয় সে ক্ষেত্রে করোনারি আর্টেরিও-গ্রাফির কথা বিবেচনা করা উচিত। তাছাড়া সার্জারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৯. মায়োকার্ডিয়াল ইন্‌ফার্কশন্‌ (Myocardial Infarction)

করোনারি আর্টারিতে রক্ত প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে একটা বিপজ্জনক বিন্দুতে (a critical point) তখনই পৌঁছায় যখন রক্তবহানালীর

ভিতরকার ডায়ামিটার শতকরা 70 ভাগ বা তার বেশী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঠিক সেই অবস্থায় রক্তবহানালীর অন্তর্নিহিত দেশে (inner surface) যে মসৃণ লাইনিং বা পর্দা থাকে (যেটা এই সময় বাধা-প্রদানকারী আথেরোমেটাস প্লাক্‌টিকেও ঘিরে থাকে) তাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতের (tears) সৃষ্টি হয়। এর ফলে রক্তবহানালীর অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যখন এই ঘটনা ঘটতে থাকে, তখন হার্ট মাসল-এর একটি অংশে অক্সি-জেনের যোগান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে সেই অংশের তন্তু বা টিস্যুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় (necrosis)। হার্ট মাসল-এর এইরূপ প্রচণ্ড ক্ষতকে (massive injury) বলা হয় মায়ো-কার্ডিয়াল ইন্‌ফার্কশান। সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে বলি "হার্ট অ্যাটাক"।

করোনারি ধমনীতে রক্ত প্রবাহ অবরুদ্ধ কেন হয়? এর একটা উত্তর হচ্ছে যে ধমনীর দেওয়ালে স্থানীয় সংকোচন (localised spasm)। আবার লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এই প্রচণ্ড স্থানীয় সংকোচন কেন হয় তার কোনো সদুত্তর নেই। সন্দেহ করা হয় যে, যে সব ব্যক্তির মধ্যে নার্ভ উদ্দীপকের (nerve stimuli) প্রতি প্রবণতা অধিকতর সেইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় নার্ভ উদ্দীপনার (localised nerve iritation) জন্য এইরূপ সংকোচন (spasm) হতে পারে। তবে এটা নিছক সন্দেহই, তার বেশি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করোনারি হার্ট ডিজিজ্‌ ও মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান-এর কারণ হলো নিঃসন্দেহে আথেরো-স্ক্লেরোসিস্‌। তাহলে মায়োকার্ডিয়াল্‌ ইনফার্কশন্‌ বলতে আমরা বুঝি মায়োকার্ডিয়ামের বা হৃদপেশীর মৃত্যু বা মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস্‌। এই মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস্‌ ঘটে তখনই যখন করোনারির রক্তের যোগান ও উপযুক্ত রক্তের জন্য মায়ো-কার্ডিয়ামের চাহিদার মধ্যে একটি আশঙ্কাজনক অসামঞ্জস্য (critical imbalance) ঘটে। এই ইনফার্কশন হার্টের সাবএণ্ডোকার্ডিয়ামে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, অথবা হার্টের পেশীগত অংশে) অথবা সম্পূর্ণ মায়োকার্ডিয়ামে ছড়িয়ে যেতে পারে (তখন একে বলে ট্র্যান্সমুরাল ইনফার্কশন)।

সময় সময় এমনও হতে পারে যে এই ইনফার্কশান্ খুব হাল্কা (mild) ভাবে নিঃশব্দে ঘটে (তখন একে বলা হয় সাইলেন্ট ইনফার্কশান্)। পরবর্তী পর্যায়ে ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফিতে ধরা পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এর আক্রমণ এমনই আকস্মিক হয় যে সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপেশীর অসমঞ্জস ও দ্রুত সংকোচনের ফলে (ventricular fibrillation বা অ্যাসিস্টোল্) মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যদি ইনফার্কশান জনিত এই হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়—যা কিনা এই রোগের এক অত্যন্ত আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতি—তা হলেও আর এক উদ্বেগজনক অবস্থা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন বা অ্যারিদ্মিয়া arhythmia), ইনফার্কশনের পরবর্তী ঘণ্টা কয়েক উপস্থিত থাকে, যদিও তা খুব ধীরে ধীরে অপসৃত হয়। মায়োকার্ডিয়াম কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বোঝা যায় কার্ডিয়াক ফেলিওরের গতি-প্রকৃতির ওপর।

মায়োকার্ডিমাল্ ইনফার্কশনের প্রধানতম লক্ষণ হলো বুকে যন্ত্রণা, শ্বাসহীনতার ভাব, বমনেচ্ছা, প্রচণ্ড ক্লান্তিভাব ও অচৈতন্য অবস্থা (syncope)। অনেকের মধ্যে দেখা যায় পালমোনারি ইডিমা (ফুসফুসের অস্বাভাবিক শোথ বা স্ফীতি), অচৈতন্যতার সঙ্গে রক্তচাপ হ্রাস। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বমি লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষ করে যদি বেশ গুরুতর ভাবে ইনফার্কশন্-এর আক্রমণ ঘটে। ক্বচিৎ কদাচিৎ ক্ষেত্রে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন ধরা পড়ে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর থেকে এণ্ডোকার্ডিয়াল থ্রম্বোসিস্ সৃষ্ট হয়ে সিস্টেমিক এম্বলিজম্ পরিদৃষ্ট হয় (রক্ত দলা বাঁধে বা চাপ বাঁধে বা এম্বোলাস্ বা ক্লট্ তৈরি হয়ে শারীরিক ব্যবস্থায় প্রকট হওয়াকে বলে সিস্টেমিক্ এমবলিজম্)। লক্ষ্য করার বিষয় হলো অ্যানজাইনা পেক্টোরিসে যে সব জায়গায় যন্ত্রণা হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশানে সেই সব জায়গাতেই যন্ত্রণা অনুভূত হবে, তবে এ ক্ষেত্রে যন্ত্রণার আধিক্য ও স্থায়িত্ব অধিকতর হয়। হৃৎস্পন্দন দ্রুত লয়ে বেড়ে যায়।

হার্টের নিম্নদিকে অর্থাৎ ইনফিরিয়র ইনফার্কশনে প্রায় ক্ষেত্রেই চোয়ালের শিরার চাপ (jugular venous pressure বা JVP) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ এ ক্ষেত্রে ডান দিকের নিলয় বেশি জড়িত

থাকে। প্রথম হৃৎশব্দ প্রায়ই শান্ত থাকে এবং একটি তৃতীয় বা চতুর্থ শব্দ শোনা যায়। হৃৎযন্ত্রের চূড়োর দিকে বিস্তৃত কম্পন (a diffuse apical pulsation) অনুভূত হয় যখন অগ্রবর্তী হৃৎপেশীর ক্ষতি (অ্যান্টেরিয়ার মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজ) বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। রক্তচাপ যদি কমে যায় তাহলে অস্বাভাবিক কম পরিমাণে প্রস্রাব (অলিগিউরিয়া oliguria) একটি সাধারণ উপসর্গ এই সব ক্ষেত্রে। তার মানে এই নয় যে এমত অবস্থায় ডাইইউরেটিক থেরাপি (diuretic therapy), বা যে চিকিৎসায় প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়) শুরু করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে অস্বাভাবিক কম পরিমাণ প্রস্রাবের সঙ্গে দেহের মধ্যে তরলাধিক্য জনিত অন্যান্য উপসর্গ আছে কি না এবং যদি থাকে তখনই ডাইইউরেটিক থেরাপির কথা চিন্তা করতে হবে।

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে আক্রান্ত রুগীদের প্রায় ক্ষেত্রেই অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন বা তার প্রকারভেদ হয়ে থাকে, কিন্তু খুব একটা গুরুতর আকারে নয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বা ডিগ্রির হার্ট ব্লক (যথা, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি ইত্যাদি) লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিদ্‌মিয়ার একটা খুবই সাধারণ প্রকাশ হলো হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিক গতি (sinus tachycardia)। কিন্তু ইনফিরিঅর ইনফার্কশনে হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিক মন্থরতা (sinus bradycardia) লক্ষ্যণীয়। শতকরা 15 ভাগ রুগীর মধ্যে অলিন্দের অসমঞ্জসতাজনিত অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন বা এট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া বা ফিব্রিলেশন (fibrillation) লক্ষ্য করা গেছে। এবং নিলয়ের অসমঞ্জতা দরুন ভেন্ট্রিকিউলার ট্যাকিকার্ডিয়াও একটা লক্ষ্যণীয় জটিল উপসর্গ। যেটা সব চেয়ে উদ্বেগের কারণ তা হলো ইনফার্কশনের প্রথম ঘন্টাটি। কারণ দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথম ঘন্টার মধ্যেই রুগীকে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করার আগেই যদি ভেন্ট্রিকিউলার ফিব্রিলেশন (নিলয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন) শুরু হয়ে যায় তা এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে রুগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফি, রক্তরস উৎসেচক (plasma enzyme)

পরীক্ষা, বুকের এক্সরে, অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা, রেডিওনিউক্লাইড স্ক্যানিং ইত্যাদির সাহায্য ইনফার্কশনের পরবর্তীকালে অনুসন্ধান চালানো হয় তবে সর্বাপেক্ষা জরুরি ব্যাপার হলো প্রথমেই ব্যথার উপশম করা এবং তারপরে চিকিৎসার মাধ্যমে অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি বিভিন্ন জটিলতা দূরীকরণ। যাতে পুনর্বার ইনফার্কশন না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। এবং পরিশেষে রুগীকে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরিয়ে আনা হয়।

উপরিউল্লেখিত রোগগুলি ছাড়াও হার্টের আরও অনেক রোগ হয়ে থাকে যেমন, ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট ব্লক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, কার্ডিয়াক ফেলিওর, হার্ট-ভাল্বের বিভিন্ন রোগ (যথা, মাইট্রাল স্টেনোসিস, এ্যাওরটিক স্টেনোসিস ইত্যাদি), হৃৎ-পেশীর বিভিন্ন রোগ (যথা, হাইপারট্রোফিক কার্ডিওমাওপ্যাথি, টিউবার-কিউলাস পেরিকার্ডাইটিস ইত্যাদি), ধমনী ও শিরার বিভিন্ন রোগ (যথা, আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস) প্রভৃতি। ভূমিকাতেই বলেছি আমার এই বই সাধারণ পাঠকের জন্য, তাই অপ্রয়োজনবোধে এইসব হৃৎযন্ত্রে সংবহনতন্ত্রের রোগের আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। তার চেয়ে বরং আলোচনা করা যাক সেই সব অন্যান্য দিকের যাদের সঙ্গে করোনারি হার্ট ডিজিজের সহজবোধ্য সম্পর্ক আছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় জীবনযাপনের ধরন-ধারণের (life-style) কথা। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে মানুষকে (psychodynamic behavioural characteristics) দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ 'এ' শ্রেণী এবং 'বি' শ্রেণী (টাইপ A এবং টাইপ B)। টাইপ A-র অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে যে চারিত্রিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যাবলী দেখা গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে এইসব ব্যক্তি সাহসী, কর্মোদ্যমী, বেশি মাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভীষণভাবে সময়-সচেতন, ও ধৈর্যহীন। টাইপ B-এর অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে যে চারিত্রিক এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যাবলী দেখা গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে এই সব ব্যক্তি শান্তিপ্রিয়, কর্মবিমুখ না হলেও খুব একটা কর্মোদ্যমী নন, ঝামেলা-মুক্ত থাকতে ভালোবাসেন ইত্যাদি। পরিসংখ্যানগত হিসেবে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা টাইপ A অন্তর্গত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনকভাবে

অধিকতর। কারণ তাঁদের জীবনযাপনের ধরন টাইপ-B থেকে আলাদা এবং জীবনযাপনের ধরন-ধারণের সঙ্গে হৃদ্‌রোগের এক বিশেষ সম্পর্ক আছে। যেমন, দেখা গেছে যে টাইপ A-র মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা খুবই বেশি এবং আমরা জানি যে ধূমপান হৃদরোগের অনেকগুলো প্রভাবশালী কারণের মধ্যে একটি। আবার রক্তে গড় কোলেস্‌টেরলের মাত্রা, উচ্চ রক্তচাপ টাইপ-A-র মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। কারণ দেখা গেছে টাইপ-A অন্তর্গত ব্যক্তিরা অনেকেই মানসিক চাপ বা টেনশনে ও অস্বস্তিতে ভোগেন এবং এই টেনশন থেকে সাময়িক মুক্তি লাভের জন্য মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। তৎসহ থাকে খাদ্যাভ্যাসের অবিবেচকতা। এর সামগ্রিক ফল হৃদরোগ ডেকে নিয়ে আসতে পারে, ক্রমশ বা হঠাৎ। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, যে সব ব্যক্তি মাত্রাধিক ভাবে ধূমপানে ও মদ্যপানে আসক্ত এবং যাঁদের খাদ্যাভ্যাস অবিবেচকতাপ্রসূত তাঁদের মধ্যে অচিরেই টাইপ-A বৈশিষ্ট্যাবলী এসে যায়, যদিও তাঁরা প্রাথমিক ভাবে টাইপ-A পর্যায়ভুক্ত নন। এই সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাইপ-A সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী গৌণ, এবং তাঁদের জীবনযাপনের ধরন-ধারণ মুখ্য হয়। Mayer friedmen ও Ray H. Rosenman (Type-A/B-র প্রবক্তা) মনে করেন, "Type A behaviour is, in and of itself, a primary mechanism"।

করোনারি হার্ট ডিজিজের আরও একটি প্রভাবশালী কারণ দৈহিক পরিশ্রম, বরং বলা যেতে পারে দৈহিক পরিশ্রমের অভাব। আধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের প্রায় শ্রমবিমুখ করে তুলেছে। আমরা হাঁটি কম, যানবাহনে চড়ি বেশি। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে কতো শ্রম-লাঘবকারী সরঞ্জাম আমাদের পরিশ্রম পরাঙ্মুখ করে তুলেছে ও তুলছে। এটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সত্যি যে নিয়মিত সহনশীল মাত্রায় দৈহিক পরিশ্রম হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে, যদি দেহ সুস্থ সবল অবস্থায় থাকে। আমি এখানে 'নিয়মিত' ও 'সহনশীল মাত্রা' কথাগুলির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। কারণ অনিয়মিত ও অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রম নিরর্থক। সপ্তাহে একদিন কি দুদিন টেনিস খেলা বা জগিং করা যতো না উপকারী তার চাইতে বেশি উপকারী হলো নিয়মিত দৈহিক পরিশ্রম করা। দেখা গেছে

যে সাঁওতালদের মধ্যে যারা খুবই কর্মঠ, করোনারি হার্ট ডিজিজ খুবই কম হারে হয়। পক্ষান্তরে, যারা অলস জীবনযাপন করে এবং স্নেহজাত খাদ্যের ওপর যাদের প্রবণতা বেশি তাদের মধ্যে এই রোগের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ বেশি পরিমাণে চর্বি-জাতীয়, মেদবহুল, স্নেজাতীয় ও কোলেস্টেরোল-সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে যদি শারীরিক পরিশ্রম না করা হয় তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লে-রোসিস হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তার অর্থ কখনই এই নয় যে শুধুমাত্র দৈহিক পরিশ্রম করলেই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। বক্তব্য হচ্ছে এই যে দৈহিক পরিশ্রমের ফলে রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নত হয়, অক্সিজেন যথাযথভাবে শরীরে ব্যবহৃত হয়, হার্ট রেট ধীর গতিতে চলে, হার্টের যে পাম্পিং চেম্বারগুলো আছে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর আরও কিছু উপকারিতা আছে ; যেমন, বৃহৎ করোনারি ধমনীগুলির ব্যাস বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং হার্টের সন্নিকটবর্তী রক্ত নালিকাগুলির মধ্যে যে সংযোগরক্ষাকারী বিভিন্ন প্রণালী বা চ্যানেল আছে সেগুলি দৈহিক পরিশ্রমের ফলে সুস্থ থেকে রক্ত সঞ্চালন কার্য সহজতর করে। চর্বি-জাতীয় উপাদান ক্রমশ জমতে থেকে রক্তে যে শক্ত দানার মতো বস্তুর (clot) সৃষ্টি হয় তার সম্ভাবনা বহুলাংশে দূরীভূত করা যায় কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে। যে সব ব্যক্তি মোটেই কায়িক পরিশ্রম করেন না বা নামমাত্র করেন, তাদের মধ্যে রক্ত দলা বাধার ঝুঁকি বেশি পরিলক্ষিত হয়।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে হৃদ্‌রোগের কারণ একাধিক। কোনো বিপাকীয় অনিয়মের (মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের) জন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে জন্মগত হৃদ্‌রোগ বা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে। বেটা হেমোলিটিক স্ট্রেপটোকক্কাস বীজাণু বাহিত সংক্রমণের ফলে রিউম্যাটিক ফিভার এবং এর ফলে হৃৎযন্ত্রের কপাটিকার ক্ষতি হতে পারে। আবার ভাইরাস সংক্রমণ, বিপাকীয় অনিয়ম ও মাত্রাধিক পানাসক্তির ফলে হৃৎ-পেশীর রোগ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের ফলেও হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা প্রবল। এবং সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে করোনারি আথেরোস্ক্লেরোসিস্-এর যেটি সব থেকে বড়ো আসামী। সত্যি কথা বলতে কি এখনও পর্যন্ত

করোনারি হার্ট ডিজিজ একটি প্রধান সমস্যা। শুধুমাত্র সচেতনার মাধ্যমে এর আক্রমণ বোধ করা যেতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অত্যন্ত আশ্চর্যজনক পদ্ধতির সাহায্যে হৃদ্‌রোগের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু রূঢ় সত্য হলো এই যে হৃদরোগকে নির্মূল করতে, বা এর আধিক্য কমাতে, আরও বেশি সচেতনতা, শিক্ষা ও প্রয়াসের প্রয়োজন। যদি আমরা আগে থাকতেই সেই সব প্রভাবশালী কারণ চিহ্নিত করেত পারি যাদের প্রভাবে হৃদ্‌রোগ হয় ও তদনুযায়ী জীবনযাপন করি তাহলে এই সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে অসুবিধা হবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

উপসংহার

এটি প্রমাণিত সত্য যে সব দেশে এবং সব কালে হৃদযন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের রোগ থেকে মৃত্যুর হার বেশি, যদিও সব দেশে এই রোগের চরিত্র (pattern) লক্ষ্যণীয়ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ভিন্ন। যেমন, আজকাল বৃটেনে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজে 20—35 বয়সের ব্যক্তিদের মৃত্যুর হার দিনদিন কমে আসছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা দেখা যায় না। আবার কোনো কোনো দেশে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গুরুতররূপে ক্রমবর্ধমান। চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্যণীয় উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার আজকাল সব দেশেই পূর্বের তুলনায় অনেক কম। অধিকাংশ ব্যক্তিই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। কিন্তু এর একটু অন্য দিকও আছে। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার ফলে হৃৎযন্ত্রের কপাটিকার ক্ষমতা আগের মতো থাকে না, বরং হ্রাস পায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ প্রৌঢ়ের হৃৎযন্ত্রের কপাটিকার রোগ থাকা বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক, আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি যে করোনারি হার্ট ডিজিজ ও হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে কতকগুলি প্রভাবশালী ও নির্দিষ্ট কারণ জড়িত থাকে। আশার কথা সব দেশেই হৃদ্‌বিশেষজ্ঞেরা এই সব কারণকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এবং সেই সঙ্গে এটাও ধরতে পেরেছেন যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এই কারণগুলো কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন রোগের হেতু হিসাবে। তাই তাঁরা হৃদ্‌রোগ হওয়ার অনেক পূর্বে কতকগুলি ব্যাপারে আগে থাকতেই সাবধান হবার পরামর্শ দেন। তাঁদের পরামর্শ মতো জীবনকে নিয়ন্ত্রিত রাখলে এই রোগের আক্রমণ বহুলাংশেই এড়ানো যায়। যেমন, তাঁরা সব সময়েই বলেন যে দেহের ওজন সম্বন্ধে সাবধান থাকতে। কারণ বেশি ওজন প্রায়

ক্ষেত্রেই একটি বিপদের সংকেত—সময় থাকতে থাকতে ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করুন, তা না হলে পরে বিপদ হতে পারে। কি বিপদ? না হৃদ্‌রোগের প্রবল সম্ভাবনা। কারণ ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য কিছু বিপত্তি ঘটবার, যেমন রক্তচাপ বৃদ্ধি, রক্তে কোলেস্টেরোল বৃদ্ধি ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে। এইগুলিই হলো ঝুঁকির ব্যাপার বা বিপদের কারণ যা থেকে আগে থাকতেই সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই বলা হয়ে থাকে যে বিশেষ করে যাঁরা মধ্যবয়স্ক তাঁদের মাঝে মাঝে মেডিক্যাল চেক্‌-আপ করা উচিত। স্মরণ করুন সেই ইংরাজি প্রবাদ বাক্যটি: 'Prevention is better than cure' (রোগ সারানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয় সেটাই ভালো)।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞরা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন হৃৎযন্ত্রের ও রক্তসংবহনতন্ত্রের নানা অসুখের মোকাবিলা করার জন্য। বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক উন্নতির ফলে তাঁরা অনেক আধুনিক উপায়ের মাধ্যমে তাঁদের প্রয়াস অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। হৃৎযন্ত্রের অসুখের নিদানে বা ইনভেস্টিগেশনে এবং চিকিৎসায় ইলেক্‌ট্রোকার্ডিওগ্রাফির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ই সি জি বা ইলেক্‌ট্রোকার্ডিওগ্রাফির প্রধান গুরুত্ব হলো যে এর সাহায্যে অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ও সঞ্চারত্রুটি (কণ্ডাকশন ডিফেক্ট) মূল্যায়ন খুব সহজে করা যায়। মাওকার্ডিয়াল ইনফার্কশান নিরূপণের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও ই সি জির মাধ্যমে ডিজিটালিস ও ফুডজনিত বিষক্রিয়া (রুগ্ন হৃৎযন্ত্রকে সতেজ রাখার জন্য ডিজিটালিস প্রয়োগ করা হয়), ইলেক্‌ট্রোলাইট বিশৃঙ্খলা ও হৃৎযন্ত্রের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (হাইপারট্রোফি) অনুধাবন করা যায়। এর পরেই আমরা উল্লেখ করতে পারি হার্টের রোগে এক্সরে (রেডিওলজিক্যাল) পরীক্ষার কথা, কারণ এই পরীক্ষায় হার্টের বর্তমান আকার ও আকৃতি ছাড়াও আমরা ফুসফুসের রক্তবহা নালিকার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি। দু' রকমের এক্স-রে নেওয়া হয়: পিছন থেকে সামনে (পস্টেরো-অ্যান্টেরিওর—PA) এবং সামনে থেকে পিছনে (অ্যান্টেরো-পস্টেরিওর—AP)। কিন্তু দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ AP খুব একটা কার্যকর নয় শুধুমাত্র এই কারণে যে এই এক্স-রে-তে হার্টের রেখা (outline) খানিকটা বিকৃতাকারে আসে। এক্সরে-র

সাহায্যে হার্টের আকার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা হয় একটি তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে ঃ সমউচ্চতায় হৃৎপিণ্ডের রেখার সর্বোচ্চ প্রশস্ততার সঙ্গে বুকের খাঁচার আড়াআড়ি ব্যাসের তুলনা করা। এইরূপে নির্দিষ্ট হৃৎপিণ্ড ও বুকের খাঁচার (কার্ডিও-থোরাসিক) অনুপাত হওয়া উচিত 0·5-এর কিছু কম। নাড়ীর অস্বাভাবিক স্পন্দন অনুধাবন করতে হলে রেডিওস্কোপির (স্ক্রিনিং) সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু রেডিওস্কোপির প্রধান ব্যবহার হয় কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেশন ও পেসমেকার বসানোর সময়।

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য ও গতি এবং হৃৎ-যন্ত্রের ভিতরকার বিভিন্ন অংশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়। ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে আলট্রাসাউণ্ড তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া এম-মোড্ ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ক্রস-সেক্শানাল রিয়েল-টাইম ইকোকার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। আরও নিখুঁতভাবে পরীক্ষাকার্য চালানোর জন্য ডপ্লার ইকো, কার্ডিও-গ্রাফির মাধ্যমে রক্তপ্রবাহের অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি (যেমন অ্যাওর্টিক, মাইট্রাল বা ট্রাইকাস্পিড রিফ্লাক্স্) অনুধাবন করা যায়। আবার ফোনো কার্ডিওগ্রাফির সাহায্যে হৃৎযন্ত্রের শব্দ ও মর্মধ্বনি (mur-mur) সহজতরভাবে শোনা যায় (অস্বাভাবিক শব্দকে 'মারমার' বলা হয়)। মাইট্রাল স্টেনোসিস, এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফোনোকার্ডিওগ্রাফি খুবই উপকারী।

কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেশন ও অ্যানজিওকার্ডিওগ্রাফিকে বলা হয় 'প্রবেশকারী পদ্ধতি' বা ইনভেসিভ টেকনিক। কার্ডিয়াক ক্যাথি-টারাইজেশন পদ্ধতিতে একটি সরু নল (ক্যাথিটার) শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট করে আস্তে আস্তে দক্ষিণ অলিন্দের দিকে এগিয়ে নেওয়া হয়, এবং তারপর দক্ষিণ নিলয় ও ফুসফুসাধিগ ধমনীর মধ্যে তাকে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত রেডিওগ্রাফিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

আর এক প্রকার পদ্ধতির নাম 'রেডিওনিউক্লাইড স্ক্যানিং' যাতে গামা রশ্মি ও গামা ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতি দুই প্রকারের ব্লাড পুল স্ক্যানিং ও মায়োকার্ডিয়াল স্ক্যানিং।

করোনারি হার্ট ডিজিজের চিকিৎসায় চিকিৎসাবিজ্ঞান যে কত আধুনিক ও উপযোগী পদ্ধতির উদ্ভাবন করছে সেই প্রসঙ্গেই উপরি-

উল্লেখিত বিভিন্ন পদ্ধতির শুধুমাত্র নাম উচ্চারণ করলাম। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্যই শুধু নামোল্লেখ করা হলো। এর বেশি কিছু নয়। শুধু একটা ব্যাপারে আমি সতর্ক করে দিতে চাই হৃদ-রোগের চিকিৎসা ও কার্ডিও-থোরাসিক সার্জারি ব্যয়সাপেক্ষ। তাই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে জীবনকে এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা যাতে এই রোগের শিকার হতে না হয়। এবং এই দিকটাকেই বিশেষ জোর দিতে আমি পাঠকগণকে অনুরোধ করব। সেই সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য অনুরোধ করব।

১. হৃৎযন্ত্রের সঙ্গে বংশগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক : কারণ হৃৎ-যন্ত্রের রোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। আমাদের শারীরিক কাঠামো, চেহারা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হৃৎযন্ত্র ও সংবহন ব্যবস্থায় বংশগত ধারার একটি প্রভাব আছে। আমাদের শারীরিক কোষের প্রতিটি নিউক্লিয়াসে উপস্থিত ক্রোমোজমের অন্তর্গত জিনের (genes) সাহায্যে বংশগত ধারা নিরূপিত হয়। তা এর সঙ্গে হৃৎ-যন্ত্রের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক অনেক। তার মধ্যে একটির আলোচনা আমরা আগেই করেছি (কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ)। এই রোগটি হয় বংশ পরম্পরায়—জিন বাহিত হলে (জেনেটিক ট্র্যান্সমিশনের) তার মাধ্যমে অথবা গর্ভাবস্থায় যুক্ত (ইনট্রাইউটেরাইন শিশুর ভূমিষ্ঠপূর্ণ অবস্থা) ক্ষতির জন্য। করোনারি হার্ট ডিজিজ ও উচ্চ রক্তচাপের নিদানবিদ্যায় (ইটিওলজি) বংশগত ধারার প্রভাব অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি। তাই শুধুমাত্র বংশগত কারণকে কখনই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় না। দেখা উচিতও না। যে সব প্রভাবশালী কারণের সঙ্গে হৃৎরোগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনের মাধ্যমে তাদের দূরীকরণই শ্রেয়। তাই বলা হয় "to modify the modifiable risk factors in a rewarding effort"।

২. **হার্টের সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক :** বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্ষমতারও পরিবর্তন হয়। যে খেলোয়াড় বা সাঁতারু অল্প বয়সে যতটা শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী থাকে বয়স বেশি হলে সেই একই ক্ষমতা কী আর থাকে? নিশ্চয় না। বয়স যত বাড়ে রক্তবাহিকা নালীর দেওয়ালগুলি তাদের স্থিতি-স্থাপকতা হারাতে থাকে; হৃৎযন্ত্র ও সংবহনযন্ত্রের ব্যবস্থায় পরিবর্তন

লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পরিবর্তন সব দেশে সব জাতির মধ্যে একই ভাবে হয় না ; যেমন, আগে ভাবা হতো রক্তচাপের বয়স-ভিত্তিক বৃদ্ধি পশ্চিমের দেশে যদি বেশি পরিলক্ষিত হয় তবে তা ভারতবর্ষে বা চীনে নাও হতে পারে। এখন এই মত উপেক্ষণীয়। কারণ আগে ভাবা হতো 100 সংখ্যার সঙ্গে ব্যক্তির বয়স যোগ করলে রক্তে সিস্টোলিক চাপ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে এই মত একেবারেই অগ্রাহ্য। বক্তব্য হচ্ছে এই যে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে হৃৎযন্ত্র ও সংবহনতন্ত্রের ব্যবস্থার সম্পর্ক থাকলেও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার সতেজতা (বয়স বৃদ্ধি সত্ত্বেও) রক্ষা করা যায়।

৩. **হার্টের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক :** বৃহত্তর অর্থে যেখানে আমরা বাস করি সেইটাই আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ, আমাদের, আমাদের প্রত্যেকের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মী এবং আমাদের ও তাদের সামাজিক, কৃষিগত ও কর্মগত পরিমণ্ডলকে যে সব বৈশিষ্ট্যাবলী বিধৃত করে থাকে বৃহত্তম অর্থে তাকেই 'পরিবেশ' বলব যার মধ্যে থেকে আমরা ধীরে ধীরে বেড়ে চলি। তদুপরি আছে জাতিগত বৈশিষ্ট্য। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও স্থানগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জলবায়ুর গুরুত্ব সর্বাধিক। নিরক্ষীয় তাপরেখা ও মেরুশান্তমণ্ডল বাদ দিলে সাধারণ পর্যায়ে জলবায়ুর ভূমিকা হৃৎযন্ত্রের অসুখের ক্ষেত্রে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ইটালিয়ান ও গ্রীকদের মধ্যে করোনারি হার্ট ডিজিজের আধিক্য নরওয়েজিয়ান ও নর্থ আমেরিকানদের চেয়ে কম। নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজের আধিক্য দেখা গেছে। আবার যাদের হার্টে ইতোমধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে সেই সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রীষ্মপ্রধান বা আর্দ্র অঞ্চল ক্ষতিকর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা যে স্বাভাবিক পরিবেশে থাকি তার কি কোনো প্রভাব হৃৎযন্ত্র ও সংবহনতন্ত্রে পড়তে পারে ? যেমন, হৃৎযন্ত্র ও সংবহনতন্ত্রে পরিবেশ দূষণ কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে ? দুঃখের বিষয়, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যানবাহনের থেকে বেরুনো ধোঁয়া (যার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড থাকে), কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদির প্রভাবে শহরের বাতাস দূষিত হয়। এর ওপর আছে জ্বলন্ত তেল, কয়লা থেকে নির্গত সালফার ডাইঅক্সাইড,

অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রভাব। এদের সামগ্রিক প্রভাবে শহরবাসীদের শ্বাসতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এখনও এটা প্রমাণিত হয়নি যে পরিবেশ দূষণের ফলে হৃৎপিন্ডের অসুখ বা ফুসফুসের ক্যানসার হয়।

৪. **হৃৎযন্ত্র ও খাদ্যাভ্যাস :** আমরা জীবন ধারণের নিমিত্ত খাদ্য গ্রহণ করি। আমরা যে খাদ্যগ্রহণ করি তার সামগ্রিক প্রভাবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। কিন্তু এই খাদ্যগ্রহণের অবিবেচকতার দরুন হার্টের ক্ষতিও হতে পারে। আমরা কি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন? নিজেকেই প্রশ্ন করুন। একটি সুষম খাদ্যের উপকরণ হলো প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, কোলেস্টেরোল, মিনারেলস, ভিটামিনস, জল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য। সুষম খাদ্য বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতপক্ষে এই সব উপকরণের পরিমাণ এমনভাবে বিন্যস্ত থাকা উচিত যাতে খাদ্য থেকে যথাযথ ভাবে ক্যালরি গ্রহণ করা যায়। যেমন, কোষ সৃষ্টি ও কোষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রোটিনের একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু সেটি সঠিক পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করার অর্থ যকৃতের ওপর বেশি চাপ দেওয়া, কারণ এই অতিরিক্ত পরিমাণ প্রোটিন যকৃতের সাহায্যে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় ইউরিয়া নাইট্রোজেনে পরিবর্তিত হয়ে প্রস্রাবের মাধ্যমে নির্গত হয়। শরীরের কোনো কাজেই লাগে না। কিন্তু প্রত্যহ কি পরিমাণ প্রোটিন দরকার? একজন সুস্থ সবল প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে প্রত্যহ 40 গ্রামই যথেষ্ট। আবার অতিরিক্ত প্রোটিনের সঙ্গে অতিরিক্ত ফ্যাট বা মেদ গ্রহণ (অন্তত হার্টের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে) খুবই ক্ষতিকর। তাই খাদ্যাভ্যাসকে যথাযথ বদল করা একান্ত দরকার। শরীর থেকে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় এবং যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার তার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত দরকার। বেশি পরিমাণে চা, কফি না খাওয়াই ভালো, এর বদলে প্রাকৃতিক ফলের রস গ্রহণ করা চলতে পারে। খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ওজনের দিকে নজর রাখতে হবে। অবিবেচনা-প্রসূত খাদ্যাভ্যাসের দরুন ওজন বেড়ে গেলে তা নিশ্চিতভাবে হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমি বক্তব্য শেষ করব আর একটি বিশেষ দিকের আলোচনা

করে। সেটা হলো 'হার্ট অ্যাটাক' থেকে আরোগ্য লাভ করার পর কি করে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে আজকাল হার্ট অ্যাটাকের পরও উপযুক্ত ও সময় মতো চিকিৎসার ফলে আরোগ্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হচ্ছে। দুঃখের বিষয় এই যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই যদি সচেতনতা থাকত ও সেই অনুযায়ী জীবনযাপনের মান সুনিয়ন্ত্রিত করা যেত তাহলে ব্যয়সাপেক্ষ এই মারাত্মক রোগের শিকার হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেত।

হার্ট অ্যাটাকের আগে ও আরোগ্য পরবর্তী সময় রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা, দৈহিক ওজন, ধূমপান, রক্তচাপ ও কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদির ভূমিকা সমান তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সব রিস্ক ফ্যাক্টর জীবদ্দশায় চিরবিদ্যমান। আরোগ্য পরবর্তী পর্যায়ে অমিতাচারের দরুন যদি রক্তে কোলেস্টেরোল বেড়ে যায়—তাহলে এ পর্যন্ত কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন ধমনীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই যাঁদের হার্ট অ্যাটাক একবার হয়ে গেছে তাঁদের নিরবধি লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এর পুনর্বার আক্রমণ না হয়। তাই দরকার অত্যন্ত নিয়মিতভাবে হৃৎযন্ত্রটিকে বাঁচানোর জন্য সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা। এর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা। এর ফলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের (যাকে বলা হয় 'the major culprit'—সব থেকে বড়ো অপরাধী) অগ্রগমন রুদ্ধ করা যেতে পারে। যাঁদের বাইপাস সার্জারি বা অন্যান্য কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি হয়েছে তাঁরাও আরোগ্য পরবর্তী পর্যায়ে সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন। অবশ্য দরকার মতো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি যদি কোনো হঠাৎ সঙ্কট দেখা দেয়।

তবে আরোগ্য-পরবর্তী পর্যায়ে কখনই সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তির ভাব থাকা অনুচিত। কারণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে মেনে চলতে হবে। তাই বলা হয়: "Risk reduction measures are always necessary to prevent new problems from arising"। এমন অনেক ব্যক্তি এখনও আছেন যাঁদের হার্ট অ্যাটাক হয়নি কিন্তু নিজেদের অজান্তেই হয়ত তাঁদের করোনারি আর্টারি অবরুদ্ধ "প্লাগ আপ" অবস্থায় আছে।

এবং করোনারি আর্টারির এই অবরোধের ফলে হয়ত অ্যানজাইনার শিকার হয়েছেন এবং বাইপাস সার্জারির সাহায্যে হার্টে রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। এমন ব্যক্তিদের অনেকেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে জীবনযাপন করেন কারণ হার্ট অ্যাটাক না হওয়ার দরুন কোনোরূপ গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। তবুও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁদেরও উচিত জীবনযাত্রার মানকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা।

হার্ট অ্যাটাক বা করোনারি বাইপাস সার্জারি থেকে আরোগ্য লাভের পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে রুগীকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা হয়। একে বলে কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন। এই সময় কতটা শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম এবং কাজকর্ম করা উচিত তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে হৃৎপেশীর কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এবং আরোগ্যলাভ কতটা সুনিশ্চিত হয়েছে তার মূল্যায়নের উপর। একজন হৃৎরোগ বিশেষজ্ঞের (কার্ডিওলজিস্টের) পরামর্শ অনুযায়ী একটা ছক বাঁধা নিয়মকানুনের মাধ্যমে চলাই যুক্তিযুক্ত। এই সুনিয়ন্ত্রিত দৈহিক কাজকর্ম খুবই উপকারী। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন হৃৎপেশীতে হার্ট মাসল-এ রক্ত সঞ্চলনের উন্নতি ঘটে, একটা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করা যায়।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে হার্ট অ্যাটাক ও করোনারি হার্ট ডিজিজ থেকে আরোগ্য লাভের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জরুরি নিয়মকানুন মেনে চললে আশঙ্কার কোনো কারণ থাকে না। বরং বলা যেতে পারে জীবন থেকে হতাশা দূর করে জীবনকে সুন্দর, ফলপ্রসূ ও বিস্তৃত করার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়। শুধু এই কারণেই আমাদের আশাবাদী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জীবনকে সুন্দর, জীবনের মানকে উন্নত ও বিস্তৃত করতে হলে শুধু ডাক্তার-নির্ভরতাই সব নয়। আপনাকেও সচেতন ভূমিকা নিতে হবে। কারণ এটা আপনার জীবন, আপনার একান্ত জীবন, আপনার গৌরবের জিনিস। সেই জীবনকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত করে দীর্ঘতর করা যায় তাহলে লাভ বই ক্ষতি নেই। এ কথা ঠিকই যে চিকিৎসাবিজ্ঞান অকল্পনীয়ভাবে দ্রুত উন্নত হচ্ছে। কিন্তু এখনও এমন কোনো আশ্চর্যজনক পিল উদ্ভাবিত হয়নি যার প্রয়োগে ধমনীর অবরোধগুলি (blockade) দ্রবীভূত করা যায় এবং

সেই প্রধান আসামী আথেরোস্ক্লেরোসিসকে সম্পূর্ণভাবে অপসৃত করা যায় যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমূহ না মেনে চলেন। কারণ এই আথেরোস্ক্লেরোসিস হলো হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও ভ্যাসকিউলার দুর্বলতার একটি প্রধানতম কারণ। আমরা দেখেছি কোন্ কোন্ প্রভাবশালী কারণে (যাদের বলা হয় 'রিস্ক ফ্যাক্টরস্') এইরোগটি ধীরে ধীরে শরীরকে কাবু করে দেয়। যেমন রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, পানাসক্তি, অলস জীবনযাপন ইত্যাদি। আমরা কি একটু চেষ্টা করলে, একটু সচেতনভাবে জীবনযাপন করলে এই সব মারাত্মক ঝুঁকিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারি না ? অবশ্যই পারি। তাই আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—কারণ, বড়ো দেরি হয়ে গেছে—এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে এই সব হেতু—যাদের থেকে ক্ষতি বেশি—এখনই চিহ্নিতকরা ও সে সব থেকে সাবধান হওয়া দরকার। হার্ট অ্যাটাক ও করোনারি হার্ট ডিজিজের অতর্কিত আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের উপায় আপনারই হাতে। নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবনের চাবিকাঠি আপনারই হাতে। এবং সেই চাবিটি হলো ঝুঁকি আছে এমন যে সব হেতু সে সব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। বলতে বাধা নেই আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে অধিকাংশ রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা ক্রম বর্ধমান। কিন্তু শেষ বিচারে আপনার স্বাস্থ্য সচেতনতাই আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করবে। কারণ, "the serum of eternal youth and the magic pill that will cure all ills are still very far away from reality"। এ কথাটি স্মরণ করে নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন যাপন করুন। পৃথিবীর সেরা তিনজন ডাক্তার তো আপনার নিকটেই থাকে। তাঁদের চেনেন কি ? তাঁদের নাম হলো : DR. DIET, (পথ্য) DR. QUIET (প্রশান্তি) AND DR. MERRIMENT (আনন্দ)।